পঞ্চম অধ্যায়

দিনলিপিকার বিনয়

দিনলিপি নিয়ে বিনয়ের একটা নরম মনোভাব ছিল—

"আমার জীবনী আমি আজকাল এইভাবে লিখি।
আমাদের দিনপঞ্জি, যার মানে শুধুমাত্র আমি
বুঝি কী কী।"[১]

কবি বিনয় আত্মজীবনী লেখেননি। পত্র-পত্রিকার অনুরোধে খণ্ড-বিখণ্ড আত্মপরিচয় লিখেছেন কিছু। তাই তাঁর কাছে 'জীবনী' শব্দের অর্থ 'জীবন থেকে উঠে আসা সাহিত্য' বলেই আমরা ধরে নেব। এমনকী, কিংবদন্তী 'ফিরে এসো, চাকা'-র সংখ্যাসূচিত কবিতাগুলিতে নিছক শিরোনামের পরিবর্তে যখন তারিখের নিয়মলিখন উঠে আসে, তার বিশেষ গুরুত্ব, নিদেনপক্ষে তাঁর জীবনের নিরিখেই, রয়েছে বই কি! তবু, তাঁর চরম অবিন্যস্ত জীবনে এমন কিছু সন-তারিখ সম্বলিত কিন্তু ধ্রুপদী মূল্য (classical values)-এর দিক থেকে মধ্যমার্গের পদ্য ও গদ্যের সন্ধান পাওয়া গেছে, যেগুলিকে 'ডায়েরি'-র শিরোপা দেওয়াটাই সঙ্গত বলে কবি স্বয়ং, সম্পাদক ও প্রকাশকের মনে হয়েছিল। বিনয়ের ব্যক্তিগত কবিতা, গান, পদ্য, প্রবন্ধ ইত্যাদি থেকে সংকলন করে প্রকাশিত এই বইটির নাম 'বিনয় মজুমদারের ডায়েরি' (১৯৯৪ খ্রিঃ)। সত্যনিষ্ঠ কবির জীবনসত্যের আঁচ তাঁর ডায়েরিতে পড়বার কথা।

দিনপঞ্জী বা কড়চা জীবনচরিতেরই একটি রূপভেদ। সংবদ্ধ আত্মচরিত লেখার বদলে কখনও-সখনও লেখক তাঁর জীবনপরিক্রমার দৈনন্দিনতাকে লিপিবদ্ধ করতে পছন্দ করেন। প্রায় সাড়ে ন'বছরের (১৬৬০ খ্রিঃ-র ১ জানুয়ারি-১৬৬৯ খ্রিঃ-র ৩১ মে) বর্ণময় জীবনের ব্যক্তিক বৃত্তান্ত স্যামুয়েল পেপিজ-এর ডায়েরি (মোট ছ'টি খণ্ডে শতাব্দীর অধিক কাল ম্যাগডালেনের গ্রন্থাগারে সযত্নে রক্ষিত থাকার পর জন স্মিথ কর্তৃক ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে পাঠোদ্ধার ও প্রকাশ)—লিখনশৈলী ও সাহিত্যমূল্য যাকে নৈর্ব্যক্তিক করেছে। উপস্থাপনাগুণের এই একই কথা বলা চলে ২য় বিশ্বসমরকালীন সময়ে অ্যাডল্ফ হিটলার-এর নাৎসি বাহিনীর হাতে দমবন্ধ কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে বন্দি ছোট মেয়ে অ্যানা ফ্র্যাঙ্ক-এর ডায়েরি (১২ জুন, ১৯৪২ খ্রিঃ থেকে ১ আগস্ট, ১৯৪৪ খ্রিঃ অবধি সময়কালের বিবরণ; গ্রন্থাকারে ১ম প্রকাশ : ২৫ জুন, ১৯৪৭ খ্রিঃ) প্রসঙ্গেও।

ঠিক এমন ধরনের অকল্পিত কড়চার নিদর্শন বাংলা ভাষায় বাঙালি লেখকদের খুব একটা

নেই। চারুচন্দ্র দত্তের 'পুরনো কথা', কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের 'পুরাতন প্রসঙ্গ', চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গদাধর শর্মা ওরফে জটাধারীর রোজনামচা', রবীন্দ্রনাথের 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি'-র নাম করা যায় অবশ্য। কিন্তু, কোথাও একটা এক্স-ফ্যাক্টরের অনবস্থিতি এগুলিকে ঠিক ডায়েরির আস্বাদন দেয়নি।

কবি কুসুমকুমারী দাশ ডায়েরি (সেপ্টেম্বর ১৯৪২ - জুলাই ১৯৪৩) লিখতেন। অতিসম্প্রতি ভূমেন্দ্র গুহ-এর সংকলন ও সম্পাদনায় তা প্রকাশ পেয়েছে ('কুসুমকুমারী দাশের দিনলিপি', সং. ও সম্পা. ভূমেন্দ্র গুহ, আদম, প্রকাশকাল জানুয়ারি ২০১৭, কৃষ্ণনগর নদীয়া ৭৪১ ১০১)। কবিপুত্র জীবনানন্দ দাশ বছরকয়েক (জুলাই ১৯২৫/ এপ্রিল ১৯২৯-মার্চ ১৯৩০) নিয়মিত ডায়েরি লিখেছেন ('দিনলিপি'/ ৪ খণ্ড, প্রতিক্ষণ, প্রথম প্রকাশ : বইমেলা, জানুয়ারি ২০০৯; কলকাতা ৭০০ ০১৩)। দিনের সাধারণ্য থেকে কবিতা-কাহিনির ছক, খসড়া, রাইটার্স নোট (Writer's Note), বিদেশি সাহিত্যের সারাৎসার— এ'সবের সঙ্গেই সেখানে মিলেমিশে আছে সবচাইতে জটিল, অসংজ্ঞেয়, তত্ত্বভারাক্রান্ত কথারাও।... ডায়েরি লিখেছেন (২১-২২-২৩ নভেম্বর-১৯৪৫/ ৫,৬,৭ অগ্রহায়ণ-'৫২ - ৮ই আষাঢ়/ ২৩.৬.৫০) সঞ্জয় ভট্টাচার্য। গৌতম বসু-র সম্পাদনায় অনতিআগে তার মুদ্রণসৌভাগ্য ঘটেছে ('স্মরণী ও সরণি'/ সঞ্জয় ভট্টাচার্যের ডায়েরি, ধানসিড়ি, প্রকাশকাল জানুয়ারি, ২০১৭, কলকাতা ৭০০০০৪)। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বেশ ক'বছরের (২৩ অক্টোবর, ১৯৪৫ খ্রিঃ-২৯ নভেম্বর, ১৯৫৬ খ্রিঃ) ডায়েরি সম্পর্কে তাঁর মরণোত্তর প্রকাশনা 'অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়' (ভূমিকা, টীকাভাষ্য ও সম্পাদনা : যুগান্তর চক্রবর্তী, পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত প্রথম দে'জ সংস্করণ : ফাল্গুন ১৩৯৬। ফেব্রুয়ারি ১৯৯০, কলিকাতা ৭০০ ০৭৩) গ্রন্থটি থেকে অবহিত হওয়া যাচ্ছে।... চল্লিশের সমর সেন একটা নাতিদীর্ঘ সময়ের দিনলিপি লিখেছিলেন। 'অপ্রকাশিত সমর সেন দিনলিপি ও জুজুকে' গ্রন্থ (সম্পা. পুলক চন্দ; দে'জ পাবলিশিং; প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ২০০৯, আশ্বিন ১৪১৬; কলকাতা ৭৩)-এ কিছু ব্যক্তিগত গদ্য ও চিঠিপত্রের সঙ্গে সম্প্রতি তা প্রথম প্রকাশ পেয়েছে। রুলটানা পৃষ্ঠায় এ-লেখাগুলিতে তিনি ইংরেজি, বাংলা দু'টি ভাষাই ব্যবহার করেছেন। Monday February 16 1976 থেকে Saturday October 30 1976 পর্যন্ত তাঁর দিবসনামার ভাষা ইংরেজি এবং Monday January 1 1979 থেকে Friday May 11 1979 সময়টিতে তিনি ভাষা বাংলায় বদলে ফেলছেন।... ধ্বংসের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় একটানা দিনপঞ্জি লিখে গিয়েছেন ১৯ আগস্ট ১৯৭১ খ্রিঃ থেকে ৬ ডিসেম্বর, ২০০৫ খ্রিঃ ইস্তক সময়সারণি জুড়ে। তারই গ্রন্থরূপ 'সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের ডায়েরি' (সম্পা. অদ্রীশ বিশ্বাস, প্রতিভাস, ১ম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০০৯, বইমেলা) বাংলা ভাষায় ডায়েরির আরও এক সাম্প্রতিক সংযোজন-নিদর্শন।...

বিনয় মজুমদারের ডায়েরির প্রথম এন্ট্রিটি ৯ চৈত্র, ১৩৯০ শিমূলপুর[২] এবং ২৪ তারিখ পর্যন্ত বিনয় তাঁর জীবনদিন টানা লিপিবদ্ধ করেছেন। এগুলির মধ্যে দিনাতিপাতের সাধারণী-কথা যেমন রয়েছে, তেমনই রয়েছে কিছু সার্থক কবিতাকলিও। "রসাত্মক মেঘ থেকে শব্দ করে জল ঝরে পড়ে/ এ সব শব্দের ছন্দ আমার মধুর লাগে খুব"[৩] কিংবা "বৃষ্টির শব্দ ও ছন্দ অনুপ্রাস বড় ভালো লাগে। ভালো লাগে।/ পৃথিবীর সর্বত্রই বৃষ্টি হয়, এমন কি আদিবাসীদের/ অঞ্চলেও বৃষ্টি পড়ে, শাশ্বত বৃষ্টিই পড়ে, বুঝি।/ বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে বৃষ্টি হচ্ছে বর্তমানে, গোবরডাঙায়/ হাবড়ায় বনগাঁয় বৃষ্টি হচ্ছে, বেশ বোঝা যায়।/ এইসব অঞ্চলের মানুষেরা বৃষ্টির বিষয়/ ভাবছে, অনেক ব্যক্তি এক সঙ্গে এ বৃষ্টির কথাই ভাবছে।/ তার মানে বৃষ্টিপাত মানুষের হৃদয়কে একধর্মী করে/ ঐক্যবদ্ধ করে, এই রাত্রিবেলা এ অঞ্চলে বৃষ্টি হচ্ছে আজ।/ এই বসন্তে এসেছে বৃষ্টি—বৃষ্টির মহিমা।"[৪] ইত্যাদি পঙক্তি নিশ্চিত কবির শ্রেষ্ঠ রচনাগুলির মধ্যে জায়গা করে নেবে। কিন্তু, প্রথমত, কবিমানসী বিষয়ক জল্পনাকে উশকে দিয়ে দ্বিতীয় কবিতাটিতে কোনও এক কেলো ও কেলোর মা'র কথা[৫] দিনলিপিকার-কবি উল্লেখ করছেন; দ্বিতীয়ত, কবিভাবিত মানুষের একধর্মিতার ভাবনায় কোথাও যেন গাণিতিক মহাসূত্র স্ট্রিং থিওরির আদল আছে। ডায়েরির একটি কবিতায় ফুলের গন্ধে চমক লেগে বিনয়কে মেতে উঠতে দেখি :

"আমার বাগানে বহু ফুল গাছ আছে, সারাক্ষণ

ফুল ফুটে থাকে গাছে; তার ফলে প্রজাপতিগুলি

উড়ে উড়ে ফুলে ফুলে মধু খায়; বারান্দায় বসে আজ আমি দেখি।

এ বিশ্বের প্রজাপতিসমূহ আমার এই পুষ্পোদ্যানে আসে।

নানান রঙের সব প্রজা<u>প্রিত</u> [...<u>পতি</u>] — সাদা, লাল, হলুদ প্রভৃতি।

আমরা কেবল এই ফুলগাছ রোপণ করেছি;

প্রজাপতিসমূহকে কখনো ডাকিনি আমি, তবু

এ বিশ্বের প্রজাপতিসমূহ নিজেরা যেচে এসে

ফুলে মধু খায় আমার বাগানে।

এই সব আশ্চর্য ব্যাপার আমাদের ঘিরে থাকে।"[৬]

'১৪ চৈত্র, ১৩৯০ শিমূলপুর' ও '১৫ চৈত্র, ১৩৯০ শিমূলপুর' শীর্ষক কবিতাদু'টিতেও তাঁর বিস্ময়ের প্রকাশ কবিতা হয়ে উঠেছে। কৃষ্ণচূড়া গাছের নামকরণ বা গ্রামে দিশিগাছ শিমূলের

নীচে বিলিতি শস্য গমের ফলন্ত খেত— সহাবস্থান না আগ্রাসন প্রভৃতি তাঁকে শিশুর কৌতূহলে, পরিণত প্রজ্ঞায় ভাবায়; তিনি ভাবেন, ভাবানও। ঘিরে থাকা ইন্দ্রিয়বোধ্য ফ্রেমটিকে নিছক প্রেমের পরিবর্তে যুক্তিতে ধরতে চান তিনি—

> "আমাদের বাঙলায় ধানক্ষেত সমূহের ধরন যেমন
>
> গমক্ষেত সমূহের ধরন তেমন নয়, স্পষ্টতই বিদেশী ধরন।
>
> এ যেন ইউরোপের কিয়দংশ দেখছি এখানে শিমূল গাছের নীচে।
>
> এইসব ধান-গম মানুষের মেধার ফসল। ধান গম খেয়ে খেয়ে
>
> মানুষের হৃৎপিণ্ড সচল থাকে এ কথা সকলেই জানি।
>
> আমি ভাবি আমাদের গ্রামে কীভাবে বিদেশী গ্রাম ঢুকে আসে ক্রমে।"[৭]

'১৬ চৈত্র, ১৩৯০ শিমূলপুর' সূচক দিনলিপিতে বিনয় বাঙালির আড্ডাপ্রিয়তার কথা বলে "এ বিশ্বের দোকানীরা চায়ের দোকান খুলে বসেছে এখানে" মনে করেন। উক্ত সনতারিখ রাত্রেই সংঘটিত ঝড়ের ইতিবৃত্তটিও তিনি লিপিচিত্রণে ধরেন এবং কী আশ্চর্য শিল্পসফলতায় সেই কালিক বিবরণকে কালোত্তীর্ণ করে দেন। উদ্ধৃতাংশ :

> "গতকাল ঝড় হল, মানুষের ইতিহাসে ঝড় হয় মাঝে মাঝে দেখি।
>
> জানিনা তখন কটা বাজে — অন্ধকারে ঘড়ির সময় ঢাকা ছিল।
>
> সেই গুপ্ত সাম্রাজ্যের সময়েও ঝড় হয়েছিল।
>
> ....
>
> গতকাল ঝড় হল, ঝড়ে সব গাছপালা ভয়ানক আন্দোলিত হল।
>
> জানিনা তখন কটা বাজে — অন্ধকারে ঘড়ির কাঁটা গলে গেছে।
>
> অমৃত ফলের এই বাগানে ঝড়ের বেগে বহু কাঁচা ফল ঝরে গেল।
>
> মানুষের ইতিহাসে অনেক অমৃত ফল অসময়ে ঝরে পড়ে ঝড়ে।"[৮]

১৩৯০ সনের ১৮ চৈত্র থেকে ২৩ চৈত্র পর্যন্ত দিনগুলিতে সম্পাদিত কর্মকথা তিনি চোদ্দ মাত্রা-চোদ্দ পঙক্তির অমিত্রাক্ষর পয়ারে সংবদ্ধ করেছেন। শব্দবিন্যাস, ছত্রসজ্জা, ছেদ ও যতি-র ভিন্ন

অবস্থিতি অধিকন্তু ‘যথা’, ‘যেমন’, ‘যেমতি’ ইত্যাদি যোজকগুলির প্রয়োগ যে মধুসূদন-প্রভাবিত, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। একটি কবিতা :

“প্রাতঃকালে আটা ক্রয় করলাম আমি।
বিপণিতে গেছলাম ক্ষুধিত শার্দুল
যেমন ভ্রমণ করে অরণ্যের মাঝে।
দেড়শত গ্রাম আটা ক্রয় করে, আমি
ফিরেছি উদ্যান পথে যেমতি নিষাদ
ক্রৌঞ্চকে শিকার করে হস্তে নিয়ে ফেরে।
অতঃপর পাচিকা সে বৃদ্ধাটির হাতে
আটা দিয়ে কক্ষে বসে শয্যার উপরে
অপেক্ষা করেছিলাম চাতকের যথা
বারিধারা পতনের অপেক্ষায় থাকে
অতঃপর মামা এসে পড়লেন একা
নিদাঘে পথিক যথা পাদপছায়াতে
এসে বলে, সেইক্ষণে বৃদ্ধাটিও এল
রুটি হাতে গাভী যথা গোবৎসের কাছে।”[৯]

আরেকটি কবিতা থেকে তৎকালে বিনয়ের মানসিক অবস্থা (অবসাদ?)-র হদিশ মিলবে। বিনয় লিখছেন— “সরল মানুষেরা কাঁদে হাসে/ অনায়াসে পাশে পাশে/ আমি তবু এদের জানি না— / খাতা জুড়ে আঁকি শূন্য/ একটি নিটোল শূন্যের ঠিকানা।”[১০] শূন্য অথবা বস্তুতই দিক্‌শূন্যপুর! উল্লেখ্য, ১৩৯০ বঙ্গাব্দের ১লা অগ্রহায়ণ বিনয়জননী বিনোদিনী প্রয়াত হয়েছেন। একা বিনয় তখন আরও টুকরো-টুকরো একা।... বিনয়ের ডায়েরিতে ওই বছরের আর কোনওই এন্ট্রি নেই।

পরের বছর অর্থাৎ ১৩৯১-য়ের আষাঢ় মাসের ২ তারিখ প্রথম বিনয়কে দিনপঞ্জি লিখতে

দেখছি। অথচ, ডায়েরির গ্রন্থরূপটিতে ১৩৯১ সন ৯ অগ্রহায়ণের প্রথম এন্ট্রি দিয়ে শুরু হয়েছে, তা সম্ভবত সম্পাদনা অথবা মুদ্রণকর্মের ত্রুটিই হবে। এর মধ্যে বিনয়ের জন্মদাতা পিতা বিপিনবিহারীর মৃত্যু হয়েছে।...পুরাকাব্যের কালে রামগিরি পর্বতে কয়েক মাস একলা যাপন করে কান্তাবিরহী যক্ষ আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে নতদেহ-গজের মতো প্রেক্ষণীয় গিরিশিখরলগ্ন একখণ্ড মেঘ দেখেছিলো। আর আষাঢ়ের দ্বিতীয় দিনে শহরছোড় একাকী আতপ্ত অকৃতদার বিনয় বৃষ্টি হতে দেখলেন—

> "আজ দিনে বৃষ্টি হল আষাঢ়ের দ্বিতীয় দিবসে।
>
> মানুষের ইতিহাসে এ প্রকার বৃষ্টি হয় বৃষ্টি হয়ে থাকে।
>
> ....
>
> মানুষের ইতিহাসে মানুষের জীবনের গানে আবহাওয়া এ প্রকার
>
> উত্তপ্ত হয় তা জানে দুনিয়ার সমস্ত মানুষ ও তাদের মন
>
> আবহাওয়া অতিশয় উত্তপ্ত হলেই কিন্তু ছন্দোবদ্ধ শব্দমালা
>
> বৃষ্টি হয়ে বৃষ্টির মতন ঝরে পড়ে আষাঢ়—শ্রাবণে
>
> অর্থাৎ যখন এই বিশ্বের আলোক সব চেয়ে বেশিক্ষণ
>
> মানব সমাজে থাকে মিলেমিশে সভ্যতায়
>
> সে সময়ে সর্বাধিক বৃষ্টিপাত হয়।"[১১]

এই বছরটিতে বিনয়ের ডায়েরির এন্টি-সংখ্যা সীমিত— আষাঢ় মাসে দু'টি (২ ও ৫ তারিখ), ভাদ্র মাসে একটি (১৮ তারিখ), আশ্বিন মাসে একটি (১৬ তারিখ) ও অগ্রহায়ণ মাসে দু'টি (৯ ও ১৫ তারিখ)।

বিনয়ের ভাদ্র মাসে লেখা দিনলিপিটিতে আত্মগত কিছু কথা ও প্রতিকথার কাটাছেঁড়া রয়েছে। কবি ও কবিতামন এক যুবক তার স্বকল্পিত একটি কবিতার বই বিনয়কে পড়ানোর উদ্দেশ্য নিয়ে আসে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে জনৈক যুবকের সৃষ্টি কবিতাগুলি অবশ্যই পড়া উচিৎ বলে তাঁর মনে হলো। কেননা, "সে অঙ্ক জানে, অঙ্ক কষে না। আমি যাদের/ হিসাব করি, তাদের জানি না।/ যাদের জানি তাদের হিসাব করি না। আমি সারা/ দিন অঙ্ক কষি, কবিতা লিখিনা। যে সারাদিন/ হিসাব করে সে কবিতা জানে না।/ আমি যুবকের কবিতা পড়তে চাই যেহেতু/

যুবকদের কবিতা সুন্দর, যদি তারা সত্যকার/ যুবক হয়।”[১২] যুবককবিকে দেখে কোথাও তাঁর প্রেসিডেন্সি-শিবপুরের সোনার খাঁচার দিনগুলির স্মৃতিজল চলকে উঠেছে হয়তো!

কবিতার আকারে লেখা অঘ্রান মাসের প্রথম দিনলিপিতে কবি তাঁর ব্যক্তিক অভিজ্ঞতাকে নিছক বৈশেষিক না রেখে বা না দেখে চেয়েছেন সাধারণ তত্ত্বাকার দিতে :

“...বুড়ি পৃথিবীর হাড় কাঁপে

রাত্রে। প্রাগৈতিহাসিক এই নারকেল তেল আজও

আমরা মাথায় মাখি, প্রাগৈতিহাসিক সব জ্ঞানী ঋষিদের

সৃষ্টি করা এই প্রিয় নারকেল তেল।

এই বিশ্বে শীত এলে নারকেল তেল জমে যায়।

এমতাবস্থায় এই তেলকে গলিয় দেন সূর্যদেব। আমি

আজকে সূর্যদেবের সাহায্যে-ও সনাতন নারকেল তেল

ভোরবেলা গলিয়েছি — মাথায় মেখেছি, আর বর্তমানে রাত্রিবেলা

তৈলতত্ত্ব ভাবি। তৈল বড় মজার পদার্থ।”[১৩]

সামান্য বস্তুটি এখানে যে ব্যাপক ভাবের সঞ্চার করেছে, নির্ভেজালভাবে তা শাণিত ও বিদ্রূপাত্মক।

মধ্য অঘ্রানের হেমন্তকালীন ভোরবেলা বাড়ির ফুলগাছের নীচে এক অমর্ত্য বালিকা বধূকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে কবির মনোজগতে ঘটে যাওয়া বিভ্রমে জন্ম নেয় এলোমেলো বাক্যেরা : “আজ ভোরে উঠে দেখি একটা ছোট্ট মেয়ে লাল কাপড় পরে আমার বাগানে এসেছে। আমি তাকে কোনোদিন দেখিনি। অনেক দিন আগে একবার দেখেছিলাম হয়তো, আমার মা তখন সশরীরে জীবিত। হয়তো জীবিত ছিলেন আমার মাতা।...টগর গাছের একটি অলৌকিক বালিকা দাঁড়িয়ে আছে। কালো চুলে পিঠ ঢেকে গেছে। মুখ সিঁদুর মাখা। কালো মুখ লাল হয়ে গেছে। এইখানে আর কেউ নাই। বিছানা থেকে আমি সব দেখতে পাচ্ছি। একটি বালিকা আসে পৃথিবীর উদ্যানে একাকী।”[১৪]

বিনয়ের ডায়েরিতে ১৩৯২ ও ১৩৯৩ সনের কোনও এন্ট্রি পাওয়া যাচ্ছে না। ১৩৯৪ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাস থেকে তিনি আবার ডায়েরির ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে সচেষ্ট হচ্ছেন। শারীরিক

অসুস্থতার কারণে সে-সময় কবি কলকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্তি। বহুদিন পর একদা কলকাতা হেঁটে ফেরা, তারপর কলকাতা ছেড়ে যাওয়া বিনয়কে বাধ্যতায় হলেও ফের কলকাতায় আসতে হলো। কিন্তু সবচে' বড় কথা শিয়ালদহ, কলেজ স্ট্রিট, গঙ্গাতীর, বিভিন্ন চেনা-অচেনা প্রকাশনাভবন, স্টেশন চত্বরের হোটেল— যা তাঁর একসময়কার প্রিয় ছিলো, সব নতুন করে ভালো লাগছে। তিনি লিখছেন— "...বড় ভালো, বড় ভালো/ অতিশয় ভালো এই পৃথিবীতে বাঁচা।"[১৫] ২০ শ্রাবণ তারিখটিকে বিনয় মোট চারবার চারভাগে লিপিবদ্ধ করেছেন। এর তৃতীয় এন্ট্রিটি খাপছাড়া, প্রকাশিত বলাগুলির অভ্যন্তরে প্রকাশিতব্য অনেক না-বলা রয়ে গিয়েছে বলে মনে হবে :

"সারাটা জীবন আমি এত বেশি...যে অন্যান্য

মহিলার কথা ভালোই লাগে না, আমি

বুঝেছি যে...প্রেম বলা ছাড়া গত্যন্তর নেই আর।

এমন আশ্চর্য...চেয়ে ফর্সা মহিলাকে আমি

...বহুবার তবুও আমার...ভালো লাগে

...তার হেতু আমার...ঠিক মেলে...

...সহিত কেবল এই...সেই হেতু ভালো লাগে সবচেয়ে ভালো।

অনেক...দেখেছি আর তাদের...তবুও...

দেহ সুন্দরীতমাই।"[১৬]

চতুর্থ অর্থাৎ শেষ এন্ট্রিতে কবি পঙক্তি বাঁধেন দৃষ্টির দর্শনে— "ফলের দোকানগুলি আছে বলে নারীর সৌন্দর্য বেড়েছে,/ সেহেতু গোলাপী রঙ এবং কমলা রঙ আরো নানা রঙ উপস্থিত/ দর্শনেন্দ্রিয়ের কাছে।..."[১৭]

শ্রাবণের ২১ তারিখ থেকে ২৩ তারিখ অবধি লিখিত দিনপঞ্জিতে 'বিশ্বযুদ্ধ' শব্দটি বারবার করে আসছে। কী একটা, কিছু একটা যে পুড়ছে তিনি অনুভবে টের পান, পোড়া গন্ধ পান বিশ্বজোড়া। আর তাই বোধহয় ডায়েরিতে সনতারিখ উল্লেখের পাশাপাশি স্থাননাম 'পৃথিবী' লেখেন। এ-কথা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। এ প্রসঙ্গেই উল্লেখযোগ্য যে, সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-ধর্মনৈতিক ক্ষেত্রে মনুষ্য-সৃজনী (অনাসৃষ্টি!) চোরা দ্বন্দ্বগুলির ধারাপাতকে ব্যঙ্গ করেই বিনয় 'যুদ্ধ' নামক গল্পটি[১৮] লিখেছিলেন। কবি যে 'বিশ্বযুদ্ধ'-এর কথা বলেছেন, তা

একান্ত মনসিজ; অন্তর্গত রক্তের ভিতরে তার খেলা, নিমসন্ধেবেলা চুপি ভুবন পেরনো। আমদের সচেতন ফারাকের ফন্দিকে বিনয় তত্ত্বরসে চান দিলেন, যুদ্ধের ওলটপালটকে জরুরি মেনে নিলেন অনেকটা "এত যে ভীষণ, তবু তারে হেরি' ধরার ধরে না হর্ষ,"[১৯]-এর মতো সুচেতনায়—

"বিশ্বযুদ্ধ সুরু হয়ে একটি বিশেষ লাভ হল।

দেখলাম মেথরের বউকেই...ব্রাহ্মণ এবং

ব্রাহ্মণের বউকেই...মেথর/ এ দৃশ্য আমি

দেখলাম দূর থেকে চেয়ে

কারণ সকলে দুই দল বেঁধে থাকছে এখন।

অবশ্য অনেকবার আগেও...এরূপ কাণ্ড

দেখেছি স্বয়ং।

চলুক চলুক যুদ্ধ, অতশয় ভালো এরকম

এক হয়ে যুদ্ধ করা। আমি এক হয়ে ইতিহাস লিখি

আমার ব্যবহারের জন্যই সেকথা

বলার তো কেউ নেই আমি একা একা শুধু হাসি।"[২০]

বিনয় যে 'বিশ্বযুদ্ধ'-কে আরোগ্য-উপশম বা অবসান হিসেবে দেখছেন, এটা স্পষ্ট। ক্রমায়ত বিস্তারমান বিবিধ নামের, বিবিধ মানের, অ-সংখ্যক যুদ্ধক্ষেত্রের সদ্‌গতি কিংবা বিস্মরণে একটি বিপুলপট বিশ্বরণের প্রয়োজন, তিনি স্বীকার যান। তাঁর এই হাসি বা অট্টহাস্য অথবা রঙ্গব্যঙ্গ আরও তীব্রতর হয় "বিশ্বযুদ্ধ সুরু হল, ছয় লক্ষ নও হাজার একষট্টিতম/ বিশ্বযুদ্ধ সুরু হল। আমি দিব্যি — বেঁচে আছি।/ তবুও নিমতলাতে পোড়ে,/ আমার শত্রুরা, আমি/ যাদের শত্রুই তারা পুড়ে পুড়ে ছাই/ হয়ে গেল লক্ষ লক্ষ বিভিন্ন শ্মশানে, কিন্তু আমি/ দিব্যি বেঁচে আছি আজো/ ভবিষ্যৎ অতিশয় ভালো।"[২১] অথবা, "দ্রুত বেগে আমি আমার দলের লোকে শত্রুদের/ পুড়িয়ে চলেছি/ শ্মশানে এ বিশ্বময়/ নিশ্চিতই মূলে আছে... অথবা পুরুষ ..."[২২] পঙক্তিগুলিতে। ঘুঁটে ও গোবরের গল্প আসলে সকলই...। ডায়েরির নিম্নোক্ত কবিতায় আপাত অর্থে বিনয়কে হতাশ্বাস বলে মনে হবে, কিন্তু যে ধরনের নির্লিপ্তি বয়নটিকে বলয়ের মতো ঘিরে

রয়েছে, তা মূলত অন্তর্লীন গ্রন্থিই :

“বর্তমান বিশ্বযুদ্ধে/ আকাশের সূর্য তারা...গ্রহ উপগ্রহ ধূমকেতু
সকলে জড়িত, এই/ পৃথিবীর পাখি যথা/ কাক, পশু যথা গরু/ ঘোড়া
বৃক্ষ দেবতারা সব/ মাটি ইট কাঠ ঘাস/ ইত্যাদি ইত্যাদি
সকলেই যুদ্ধ করে/ চলেছে এখন আর/ আমিও তো যুদ্ধ করি/
কোনো এক দলে।
সমস্ত বিশেষ্যপদ এই বিশ্বযুদ্ধ করে চলেছি এখন।
যুদ্ধ...হলে প্রাণনাশ হয়ে যাবে — এই কথা/ ঠিক, কিন্তু আর
পালাবার কিম্বা এই/ বিশ্বযুদ্ধ এড়াবার/ কোনো...
নেই, এ বিশ্বের মধ্যে/ যারা আছে, যা যা আছে/ সকলেই বিশ্বযুদ্ধ
করেই চলেছি।”[২৩]

একটি কবিতায় বিনয়ের সেই চিরচেনা কবিসত্তা ও গণিতজ্ঞসত্তার মিশেল মিলছে। যুদ্ধ, ষড়যন্ত্র, শত্রুতা, বিচ্ছেদ, জিৎ, হার, আনন্দ, দহন ইত্যাদির জন্য গণিতবদ কবি গাণিতিক ভাষ্য নির্মাণ করলেন— “এ পর্যন্ত বিশ্বযুদ্ধে/ জিতে গেছি অতএব শত্রুরা এখন ছাই/ হল।/ দ্রুতবেগে ছাই করে/ যাওয়া খুব প্রয়োজন/ ‘হু ক্যান কনভার্ট হুম/ ইন্টু জিরো’/ এ বাক্য আমিই বিশ্বে প্রথম লিখেছি.../ এটি অতি মূল্যবান।/ কোন পদ্ধতিতে আমি/ কাকে জিরো করি সেটা গোপন ব্যাপার।/ আই কনভার্ট দিস সোরস অব দি ভয়েস ইন্টু জিরো যেই/ ভেবেছি তখনি ওই কণ্ঠস্বর বন্ধ হল, আর শুনি না তো।/ যাই হোক এইভাবে বেঁচে আছি, দিব্যি আমি, সহজ ব্যাপার/ দ্রুতবেগে কাব্য লিখি এ আমার অন্যতম কাজ।”[২৪] এহেন যুদ্ধকালীন শত্রুতা নাকি শত্রুতালীন যুদ্ধই “যুদ্ধ মানেই শত্রু শত্রু খেলা,/ যুদ্ধ মানেই/ আমার প্রতি তোমার অবহেলা।”[২৫]— দু’পঙক্তির বিখ্যাত এই উক্তিটি মনে করায়। কাব্যশিল্পের উলটোছড়ের দিগন্তরেখায় বেজে যায় অন্ন-অশ্রু ভায়োলিন।...

ডায়েরির বিনয় ঐশিক সৃজনের প্রতি নম্রনীল নিচু। গ্রামের দক্ষিণ দিকে পুকুরপাড়ের শিরীষ গাছ, রসময়বাবুর বাড়ি যাবার পথের শিরীষ গাছ, বণিকবাড়ি লাগোয়া বৃহৎ বেলগাছ, বৈদ্যদের পুকুরপাড়ের প্রাচীন বেলগাছ, নিজের বাগানের তুলসীগাছ, অমলেন্দুদের বাড়ির

নয়নতারা গাছ, দক্ষিণবাড়ির মাসিদের বাড়ির সাত রকমের গোলাপগাছ, প্রফুল্ল মুদীর থেকে হাঁটাপথ-দূরত্বে অবস্থিত বেগমবাহার ফুলের গাছ, সাহাদের বাড়ির কামিনী ফুলের গাছ, লিচুগাছ, আমগাছ, পুকুরপাড়ের পেয়ারাগাছ, সরবতী লেবুগাছ, বাগানে লাগানো তালগাছ, অল্প ক'দিনের আঙুরগাছ, তিনটি জামগাছ, বাগানের শ'আড়াই খেজুর গাছ কিংবা বিক্রি করে দেওয়া ভুতোবোম্বাই আমগাছটির কথা অপার আনন্দবিস্ময়ে তাঁর দিনপঞ্জিতে আসে।[২৬] আবার দোয়েল, কোকিল, কাক, চড়াই, শালিখ, ঘুঘু, টিয়া, প্যাঁচা, কাকাতুয়া, পায়রা, হলদে পাখি, কাঠ ঠোকরাদের বাসস্বাচ্ছন্দ্য তাঁর লেখাপত্তরের উঠোন, দালান, আনাচ, ঘুলঘুলিতে; এমনকী এদেরকে তিনি 'পাখিদেবতা', 'পক্ষীদেবতা' বলেও কবিতায় ডেকেছেন।[২৭] ঠিক এর পরের দিনই পুনরায় অসুস্থ বিনয়, কলকাতা মেডিকেল কলেজের এজরা ওয়ার্ডের উনিশ নম্বর বেডে ভর্তি বিনয়, ডায়েরি লিখছেন শহরে বসে শহর থেকে অনেক দূরে (মুদ্রাদোষে[২৮])! হাসপাতালে নানা সূত্রে আসা বিভিন্ন প্রদেশের মানুষদের সঙ্গে গল্পে-গল্পে ভারত-ভ্রমণ করে নেন— নদীর আবদ্ধ ঘাট যেমন জঙ্গম জলের গল্পে মোহনার নুন পায়।[২৯] একটি কবিতায় বিনয় বলছেন— "আমার বাগানভরা/ অসংখ্য তুলসী গাছ/ কাছ দিয়ে হেঁটে গেলে/ ধর্মীয়.../ নাকে লাগে/..."[৩০]; কবিতাংশটিতে চোখে পড়ার মতো ব্যাপার হলো ধর্মীয় শব্দটির পরের ত্রিবিন্দু চিহ্নের আড়ালের অনুল্লেখটি। কিন্তু কী সেটি? সদর্থক কিছু নিশ্চয়ই নয়। সাচ্চা কমিউনিস্ট বলেই তখন মনে হয় বিনয়কে। ১৩৯৪-য়ের ২৫শে শ্রাবণ বিনয়ের ডায়েরিতে সর্বমোট ১১টি এন্ট্রি রয়েছে, চিকিৎসাধীন বিনয় তখন কোলকাতায়। তার মধ্যে অনেকক'টিই তাঁর বন্দিত্বে হাঁপিয়ে ওঠার দিনলিপি, শহরের অকরুণ কলঘরে নিষ্পিষ্ট হতে হতে লিখে ফেলেন—

> "তরুণ কবিরা আসে/ তরুণ সম্পাদকেরা/ আসে
>
> এসে প্রধানত তারা/...করে প্রায় প্রতিদিন/ আমি
>
> এদের সহিত কথা/ বলে খুব আনন্দই/ পাই।
>
> আমি এই স্থান ছেড়ে/ চলে যাব আমার গ্রামেই।
>
> গ্রামের মানুষ আমি/ এরা অনেকেই নিজেদের
>
> দেবদেবী বলে তাই/ এদের সহিত মেশা/ কষ্টকর বুঝি।
>
> অথচ আমার গাঁয়ে দেব পদবীও আছে দেবব্রত আছে।
>
> তারাও কি তবে দেব দেবী বলে নিজেদের এইসব ভাবার বিষয়।"[৩১]

বিশুদ্ধ ক্যালকেসিয়ান রবীন্দ্রনাথ তাঁর শান্তিনিকেতন বাসকালে লেখা ‘বধূ’[৩২] ও ‘চলন্ত কলিকাতা’[৩৩] নামের দু’টি কবিতায় শহরের হৃদয়শূন্যতা নিয়ে সে-কবেই আক্ষেপ করেছিলেন। প্রথমোক্ত কবিতাটির কমবেশি এক শতক সময়কাল পরে বিনয় লিখছেন এই একই বিষয়ে , ইষ্টকময় শহর ততদিনে ইষ্টকসর্বস্ব হয়েছে; পীড়িত কবির বিষাদ, ব্যথা ও সমব্যথার সফল স্তরান্বয় রয়েছে এই বহুমাত্রিক কবিতায়—

“এখানে এ শহরের/ ইটময় পরিবেশে/ কিছু নেই ইটছাড়া/ আছে

অল্প কিছু গাছপালা/ কীট নেই পতঙ্গেরা নেই

আসলে এ ইট আর বাছা কিছু গাছপালা ছাড়া কিছু নেই

এ শহরে, যদি এরা/ অভিধান খুলে দেখে/ তবে

দেখবে অসংখ্য শব্দ কলকাতা শহরেই নেই

যথা ধানগাছ পাট/ তিলফুল সরষের ফুল

ফিঙে পাখি ও দোয়েল/ বেজি ও কাঠবিড়ালী ইত্যাদি

অসংখ্য বিশেষ্যপদ/ এ শহরে নেই ফলে/ শহরের কবিদের খুব

অসুবিধা হয় বুঝি/ কবিতা লেখার খুব/ অসুবিধা হয়

উপমা যে দেবে, দেবে/ কিসের সহিত এরা/ কলকাতাবাসীরা তো/

কিছুই দেখেনি”[৩৪]

নাড়ি, বাড়ি, মায়ের হলদে শাড়ি ভুলে যেতে বসা শহুরে যন্ত্রঘর্ঘরের প্রতি তাঁর নির্মোহ বিরাগ মূর্ত হয় তাঁর ডায়েরির শহরবাসের পাতাগুলিতে; ‘সোনার পাথরবাটি’-র মতোই ‘নাগরিক কবি’ নামের শব্দবন্ধটিকে মেকি মনে করেন, জিহ্বার নিশ্চিন্দিপুরে ঝরে পলল সংবেদনা : “আর আমাদের সেই/ গ্রামমধ্যে কত প্রকারের/ পাখি আছে, সব প্রকারের পাখি গ্রামে বাস করে।/ কুমোরে পোকার থেকে/ শুরু করে জোনাকিরা। আমি তো দেখেছি/ অগণন পোকা কীট, পশু আছে নানা প্রকারের/ গ্রামেই শুয়োর আছে/ শহরে তো নেই— এইসব/ শুয়োরের আচরণ/ কী অদ্ভুত দল বেঁধে তারা/ ছুটতে ছুটতে তারা/ অল্পক্ষণ থেমে নিজ/ মাতৃস্তন্য পান করে/ দেখি/ সকল শুয়োর মোটা/ হৃষ্টপুষ্ট আমি তো এদের/ ভাবি যে বরাহ অবতার/ এরা কী সুন্দর জীবন এদের/ খাওয়া শোয়া আর কিছু সন্তানের জন্ম দেওয়া— এই/ ছিল মানুষের

লক্ষ্য/ লিখেই গেছেন ঋষিগণ/ লজ্জা ভুলে স্পষ্টভাবে পরিষ্কার ভাষাতে ঋষিরা/ লিখে গিয়েছেন খুব/ অতীত কালেই কিন্তু/ মানুষ সে লক্ষ্যে পৌঁছোতেই [ছু]/ পারে নি/ পেরেছে এই/ পশুগণ—শুয়োরেরা/ ছাগলেরা, কুকুর বিড়াল।/ এ সত্য জানতে হলে/ এই সব অবতার/ বরাহ অবতারের সঙ্গে/ ছাগ অবতারের সহিত থাকতে হয়/ শহরের কবিরা একথা/ বুঝতে সচেষ্ট হও/ গ্রামে গিয়ে থাকা ক বছর [...থাক ক'বছর]।"[৩৫]

একটা কথা বলার, ১৩৯৪ বঙ্গাব্দে বিনয়ের লিখিত সমগ্র ডায়েরিই কেবল শ্রাবণ মাস জুড়ে নিবদ্ধ এবং একটিও দিনযাপনকথা সেখানে নেই। কোলকাতায় চিকিৎসাবন্দি কবি খাপছাড়া কবিতার আকারে আত্মদর্শন বুনে গিয়েছেন। একটিমাত্র এন্ট্রিতেই[৩৬] শুধু শিমূলপুর নামটি পাওয়া যাচ্ছে। কখনও বা নেহাত অতীতকথনে ধরে রাখতে চেয়েছেন রাজা মিহিরলালের সঙ্গে একত্রে ইঞ্জিনয়ারিং ওয়ার্কশপে মিলিং মেসিন লেদ বোরিং ড্রিলিং মেসিন চালানোর দিনগুলি[৩৭]; খৃষ্টান পাড়ার ওলগা গুসেভার কাছে রুশ ভাষা শেখা[৩৮] ও ক্লিন্ট নামধেয় মার্কিন যুবকের বাড়ি দিন পনেরো অতিথি থাকা[৩৯]-র সেদিন। প্রেসিডেন্সির হস্টেল-জীবনের কথা মনে করছেন—রাজা সত্যব্রতর সঙ্গে একঘরের বসতকথাগুলো; একদিন গোলাপের রং শরীরের রঙের থেকে তুচ্ছ বলায় কোনও এক মামার কাছে থু থু-ক্কার শোনার কথাটাও মনে পড়ছে তাঁর[৪০]। ২৫ তারিখ লিখিত এই স্মৃতিকথার লেজুড় টেনে পরদিন অর্থাৎ ২৬ তারিখ ডায়েরিতে বিনয় একটি অসাধারণ প্রেম লিখে ফেলছেন— "গোলাপের রঙকে কি/ রঙ বলা যায়/ 'থুথু/ থুথু'/ এইসব ভেবে আমি উপমা দিই না আর কোনো কবিতায়।/ কারণ প্রেমিকার সঙ্গে যাকেই তুলনা করি প্রেমিকাকে ছোট করা হয়।/ বিনা উপমাতে আমি দ্রুত বেগে লিখে যাই সময়ও বাঁচে।"[৪১] বিনয়ের 'ফিরে এসো, চাকা'-পরবর্তী পর্বের নিরলঙ্কার কবিতাগুলির ক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য। শ্রাবণশেষের ডায়েরিতে আর লক্ষনীয় যা, তা হলো 'বাল্মীকি-র বিনয়'-এর পুনরাগমন! ".../ আমি পুরো...হয়ে যাই/ আর...হয়ে শুয়ে পড়ে/ মধ্যে বসি/ ...তৎক্ষণাৎ আমি...নীচু হয়েই/ আমার জিভ...আমি/ দেখি কী মসৃণ/ আমার ঠোঁটের ভিতরে...এবং জিভে...ভিতরে/ স্বাদটি অল্প খয়েরের মতো।/ ...বন্ধ করে আমি/ উঠে বসি.../ আমার"[৪২] বা, "আমি তখনি...ভিতরে...তা লেখা প্রয়োজন আছে।/ আমি তখনি...আরম্ভ করি/ বাঁ হাতের তর্জনী/ ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দিয়ে উপরের দিক/ করে আমি/ সারাক্ষণ/ আমার...তাকইয়ে দেখি/ দেখি যে আমার আছে/ এভাবে মিনিট পাঁচ/ দেখবার পরে আমি.../ থেকে ক্রমে ক্রমে দৃষ্টি উপরের দিকে/ সরিয়ে...পেটটি পুরে/ ...দেখি মুখখানি/ দেখি/ ...আনন্দে উজ্জ্বল/ তারপরে/ নীচু হয়ে জড়িয়ে ধরি ও ...খাই।/ আমার বুকের নীচে...থাকে/ খুব ভালো/ লাগে/ আমি...সবচেয়ে ভালোবাসি"[৪৩] বা, "১. এইভাবে একবার/ উচু [উঁ] হয়ে খাড়া বসে/ একবার নীচু হয়ে/ আমি.../ ২. খাড়া হয়ে বসে যেই/ ...আমি দৃষ্টি রাখি/ প্রায়/ সারাক্ষণ আমার...এবং/ ৩.

তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি/ ...ভিতরে...সর্বদা/ ৪. তারপর...বার হয়/ ...ভিতরেই...আমি/ ভালোবাসি খুব।/ ৫. এবং প্রকৃতপক্ষে/ সবচেয়ে ভালোবাসি/.../ তাও শুধু...সাথে।/ ৬. কিছুক্ষণ শুয়ে থাকি/ ...বুকের...শুই ও/ ৭. জিজ্ঞাসা করি ও...তুমি সর্বাধিক/ ...পেয়েছ কি?/ ৮. জবাবে...বলেই প্রতিবার বলে/ হ্যাঁ পেয়েছি/ সর্বাধিক...ঠিকই।”[৪৪] কিংবা “তারপর উঠে পড়ি/ দাঁড়াই মেঝের পরে/ ...ওঠে.../ চাদরটি তুলে নেয়...হেঁটে হেঁটে যায়.../ আমারই তো...পড়ে মেঝের উপরে।/ একটি গামছা দিয়ে...মুছে সে নেয়/ ...অবস্থায় হেঁটে যায়/ সে জলের কাছে/ বসে/ মগ দিয়ে...ঢালে/ ...করেও সেখানে।/ এই সব আমি দেখি/ দেখি মুগ্ধ হয়ে।”[৪৫] ইত্যাদি পংক্তিবিন্যাস কবিতা তো নয়ই, কিছুই নয়— ‘বাল্মীকি’ পর্যায়ের বিনয়ের ছায়াপাতে সৃষ্ট ‘শব্দজঞ্জাল’ বরং বলা চলে। তবু, অস্বস্তিকর ইরোটিক শব্দগুলিকে তিনি ত্রিবিন্দু চিহ্নের আড়ালে গোপন করে গিয়েছেন, এই যা!

বিনয় মজুমদারের আরও কিছু নিরবচ্ছিন্ন দিনলিপির হদিশ পাওয়া যায়। খ্রিস্টাব্দের হিসেবে এগুলির সালতামামি করা, কোথাও-কোথাও তারিখের পার্শ্বস্থিত বন্ধনীতে বাংলা তারিখের উল্লেখ রয়েছে। বারও উল্লিখিত কোনও কোনও তারিখের বাঁ-পাশে। ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল-মে-জুন— তিনি মোটামুটি ধারানিয়ম রক্ষা করেছেন এই তিনমাসের দৈনিক খতিয়ানে। কবি-লেখক-সম্পাদক-বেকার পাঠক-সাধু-পুরোহিত-শিক্ষক-কাজের ঠিকে ঝি-চাওয়ালা প্রভৃতি বিচিত্রপম চরিত্রের কথার পাশাপাশি পোস্ট অফিসের সঞ্চয় প্রকল্প, বিভিন্ন খাতে খরচের হিসেব, গণিত ও কবিতার কল্পনা-পরিকল্পনাও ইতস্তত অন্তর্গত হয়েছে। বিনয় একটি কবিতায় লিখেছিলেন—

“আমি তো প্রত্যেকবার পেয়েছি, অদ্যও আমি সানন্দে পেয়েছি।

বিস্মিত করেছি আমি সবাইকে। যতবার বৃন্দাবনে গেছি ততবার

নেচেছি; এখন এই রাত্রিবেলা অতিশয় শান্ত আমাদের গ্রাম—বাড়ি

পাশের পাশের ঘরে ঘড়ির অস্পষ্ট শব্দ এঘর থেকেও শোনা যায়।

প্রথম দু’তিন দিন বৃন্দাবনে গিয়ে আমি যে গান গেয়েছিলাম সেই গানটিই

আজ পুনরায় আমি গাইলাম বৃন্দাবনে—গীতা পড়া কী আরাম

গীতা পড়া কী আরাম। শেষে

বহু বর্ষ চলে গেলে এই কবিতাটি পড়ে আজকের সবকিছু স্মরণে আসবে।

দিনপঞ্জী লিখে লিখে এতটা বয়স হল। দিনপঞ্জী মানুষের

মনের নিকটতম লেখা।”[৪৬]

বিনয়ের এই সময়কার দিনলিপিকে প্রকৃত অর্থেই গহন মনের নিকটবর্তী বলা যায়। স্বেচ্ছানির্বাসিত কবির দিবানিশিযাপন মুখ্যত এ-লিপির বিবরণী। সকালে ভবেশের দোকানে চা-রুটির প্রাতরাশ, দুপুরে মিত্র মশায়ের ভাতের দোকানে খোলা খাতায় মাসকাবারি খাওয়া, রঞ্জিতের মুদিদোকানে টুকরো সদাই, ভবানী ঘটক (বিনয়ের ডায়েরির যুগ্মসম্পাদকের বক্তব্য অনুযায়ী বনগ্রামবাসী উক্তনামা ভদ্রলোকই সম্ভবত বিনয়কে ১৯৮৮ খ্রিঃ-র এই ডায়েরি উপহারস্বরূপ দিয়েছিলেন। ডায়েরিতে কবির ব্যক্তিগত লেখালেখির মধ্যে ভবানী ঘটক নামটিকে বারবার ঘুরে-ফিরে প্রত্যক্ষ করা গেছে। মেরুন রঙের সাধারণ মাপের ডায়েরির মলাটে অস্পষ্ট সোনালি অক্ষরে ছাপা : **Top Diary 1988**; ভিতরে ১.১.৮৮-র পাতায় স্বাক্ষরিত— ‘প্রণম্য কবি বিনয়দাকে — ভবানী। বনগাঁ, ১১.৪.৮৮’। **দ্র.** বিনয় মজুমদারের ডায়েরি, (সম্পা.) অজয় নাগ, কমল মুখোপাধ্যায়; শিলীন্ধ্র প্রকাশন, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০৬, কলকাতা পুস্তকমেলা, পৃ : ৯৯)-রণজিৎ-দুলাল-পঙ্কজ-অমলেন্দু-দেবদুলাল-বিষ্ণুপদ-বৃন্দাবন-পাঁচুগোপাল-প্রণয়-সজল প্রমুখের সঙ্গে আড্ডা, কবিতার আড্ডা— কখনও নিজের বাড়িতে, কখনও রেলওয়ে ব্রিজের উপর, কখনও বা দেবদুলালের মিষ্টির দোকান বা আশুতোষ দর্জির দোকান কিংবা মধুসূদন ঘটকের দোকানে— এই তখন তাঁর প্রাত্যহিকী। আর মাঝেমধ্যে ডাকঘরে যাওয়া— চিঠি, কবিতা প্রেরণ ও তাঁকে প্রেরিত তাঁর কবিতা আছে বা নেই-পত্রপত্রিকা অথবা তাঁর নামে আসা চিঠিপত্র সংগ্রহ করার জন্য; ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ায় গিয়ে পেনশনের চেক ভাঙানো ইত্যাদি। এ-সময়ে বিনয়ের অর্থনৈতিক অবস্থার সম্ভবত ক্রমাগত অবনমন ঘটে চলেছে। দৈনিকতার পরতে পরতে উঠে আসতে দেখা যাচ্ছে কবির জন্য বেমানান প্রচুর-প্রচুর বৈষয়িক কথা। নির্বাচিত নমুনা :

১. “ডাকঘরে গেলাম, ব্যাঙ্কে গেলাম।”[৪৭]

২. “বেরোলাম, মিত্র মশায়ের হোটেলে ভাত খেয়ে ব্যাঙ্কে গেলাম। আমার পেনশনের চেক এখনো ভাঙানো হয়নি।...”[৪৮]

৩. “অমলেন্দুর বাড়ি থেকে সুব্রত দে-র কাছে গেলাম। রাস্তায় সুব্রত-র দাদা দেবব্রত-র সঙ্গে দেখা। সুব্রত-কে আমার পেনশনের চেকখানির কথা বলেছি। সুব্রত আমার পেনশনের চেকের বিষয় সংক্ষেপে কাগজে লিখে নিল। সুব্রত-র কর্মস্থল বারাসাত যেখান থেকে পাই আমি আমার পেনশনের চেকও।...”[৪৯]

৪. "হোটেলে খেয়ে ব্যাঙ্কে। ব্যাঙ্কে আমার পেনশনের টাকার চেক আজো ভাঙানো হয় নি। বাড়ি ফিরলাম।..."[৫০]

৫. "ভবানী আমি বাড়ি থেকে বেরোলাম। ভবানী খেল দুলালের মিষ্টির দোকানে, আমি ভাত খেলাম মিত্র মশায়ের হোটেলে। তারপরে ব্যাঙ্কে গেলাম — আমার পেনশনের টাকা পেলাম।"[৫১]

৬. "তারপরে গেলাম ডাকঘরে— আমার নামে আজ কোনো চিঠিপত্র আসে নি। তারপরে গেলাম ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়াতে।..."[৫২]

৭. "গতকাল মিত্র মশায়ের ভাত খাবার হোটেলে ১৯৫ টাকা অগ্রিম দিয়েছি মে মাসের ২১ তারিখ পর্যন্ত নিরামিষ সহ ভাত খাবার জন্য।..."[৫৩]

৮. "ব্যাঙ্কে গিয়ে টাকা তুললাম ৫০/- United Bank of India থেকে।..."[৫৪]

৯. "আমার কাছে বর্তমান মুহূর্তে আছে বারো টাকা ষাট পয়সা। আগামীকাল আবার ব্যাঙ্ক বন্ধ। আমার ভাড়াটে মনোতোষ পাঁচ সাত দিন আগে কলকাতায় গেছে, এখনো ফেরে নি।"[৫৫]

১০. "আজ ভোরে আমার বাড়িতে আমার বড় দাদা অনিল বরণ মজুমদার এসেছে। আমার টাকা কিছু দাদার কাছে ছিল, এই টাকার থেকে একশ টাকা দাদা আমাকে দিল। বাড়ির গাছপালা, ফল ইত্যাদি সম্বন্ধে দাদার সঙ্গে কিছু কথাবার্তা বললাম।"[৫৬]

১১. "বিকালে প্রথমেই কেরোসিন তেল কিনেছি ১৫০ কিউবিক সেন্টিমিটার।...রসময়বাবু বলল— দাদা অনিলবরণ মজুমদার দলিলে লিখেছে আমার দাদা অনিলবরণ দালানসহ জমি বেচেছে ৫০ হাজার টাকায়।..."[৫৭]

১২. "ভোরবেলা দীপেন বসুর কাছ থেকে শুনলাম ঊষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় সোমবার বিকালে বাড়িতে আসবেন। রণজিৎ হালদারের সঙ্গে দেখা হলো। ব্যাঙ্ক থেকে ১০০ টাকা তুলেছি। ৮০ টাকা দিয়েছি ভবেশকে। আমার কাছে ৪৫ টাকা আছে। খোকন-কে বলেছি ১০০ টাকা জোগাড় করে খোকনের কাছেই রাখতে। যদি আমার দরকার হয় তাহলে তৎক্ষণাৎ যেন খোকনের কাছ থেকে পাই। খোকন কথা দিয়েছে যে খোকন ১০০ টাকা জোগাড় করে রাখবে।

আমার নতুন ভাড়াটে শচীন এখনো আসে নি। কী করছে কে জানে?..."[৫৮]

১৩. "বর্তমানে আমার কাছে আছে ৪৩ টাকা। এই টাকায় হাত খরচা চালাতে হবে অন্তত নয় দিন এইভাবে হিসাব করে চালাতে হচ্ছে আমাকে।

ডাকঘরে আজও আমার নামে কোন চিঠিপত্র আসে নি। আমার পেনশনের টাকা নিয়ে খুব চিন্তিত আছি। পেনশনের দ্বিতীয় কিস্তির চিঠি এখনো আসে নি।”[৫৯]

১৪. “...বৃষ্টি একটু কমলেই আমি ছাতা মাথায় বেরোলাম এবং অ্যালুমিনিয়ামের তৈরী USHA কুকার কিনলাম, ডেচকি কিনলাম। ব্যাঙ্কে গিয়ে টাকা তুললাম।”[৬০]

১৫. “এক কেজি চাল খেতে আমার চার দিন লেগেছে — এবং আরো সামান্য পরিমাণ চাল এখনো রয়েছে। আমি হিসাব করে দেখলাম — মাসে ৮০/৯০ টাকায় আমার দুবেলা ভাত খাওয়া হয়ে যাবে। তবে রুটি চা খেতে লাগবে প্রায় ৮০ টাকা।”[৬১]

১৬. “...আমার ঘর ঝাট দেওয়ার এবং এঁটো থালাবাসন ধোয়ার জন্য একজনকে পেয়েছি।...থালাবাসন ধোয়ার এবং ঘর ঝাট দেবার জন্য আমি প্রতিমাসে ৩০/- দেব বলে স্থির করেছি।”[৬২]

১৭. “একটি পঞ্চাশ পয়সার মোমবাতি কিনলাম।...”[৬৩]

১৮. “আজ প্রচুর বাজার করতে হয়েছে। ভোরে এক কেজি সরু চাল কিনলাম ৪.৪০ টাকা দিয়ে।”[৬৪]

বিনয় মজুমদার তাঁর আজন্মের মনের মানুষ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আত্মগত নিভৃত কোণ নির্মাণ করে বাস করতে ভালোবাসছেন একা এই তিমিরনিবিড় রাতে। “এই যে তোমার আলোকধেনু সূর্যতারা দলে দলে” [যদিও এ-বাক্যে ভুল রয়েছে, শুদ্ধ পাঠ : “এই তো তোমার আলোকধেনু সূর্য তারা দলে দলে—”; দ্র. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘৫২০’ (স্বরবিতান ৪১), গীতবিতান, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, পুনর্মুদ্রণ : বৈশাখ ১৪১৯, কলকাতা ১৭, পৃ : ২০৫] গানটি সম্বন্ধে লিখছেন[৬৫], লিখছেন— “ভবানী গান শোনালো— সুদূর বিপুল সুদূর, তুমি যে...আমি গান গেয়ে শোনালাম— সকরুণ বেণু বাজায়ে।”[৬৬], ভবানী কয়েকটি গান গাইলে “তুমি কেমন করে গান করো হে গুণী।” গেয়ে শোনান[৬৭]। ‘রবীন্দ্র-বিনয়সঙ্গীত’ প্রবর্তনের প্রসঙ্গকথাও তাঁর দিনপঞ্জি থেকে জানা যায়। মৌলিকতার তেমন কোনও নিদর্শন এখানে নেই, সুর অবিকৃত রেখে রবীন্দ্রনাথের গানের শব্দসমাহার একটু অদলবদল করে গান গাইতেন কবি, রবীন্দ্রগানে কখনও নিজস্ব পঙক্তির সংযোজনাও ঘটিয়েছেন— “আমি মুখে মুখে গান রচনা, সুরারোপ এবং গাওয়া সঙ্গে সেরে একটি গান শোনালাম ঘটককে, বলতো কার গান? ঘটক বলল রবীন্দ্রসংগীত সুর শুনে। আসলে আমার গান।”[৬৮] এই গানগুলি নিয়ে কোনও কারণে কবি অসম্ভব স্পর্শকাতর ছিলেন বলে মনে হয়, তা নাহলে “সজল আমার সম্বন্ধে বলল যে আমার গানের জন্যও আমি চিরস্মরণীয়। মাঝে মাঝে গান লেখা ভালো।”[৬৯] কিংবা “বিকালে আমার

গান ‘এ পারে নীরব হল কুহুরব ওপারে মুখর হলো কেকা ওই’ গেয়ে শোনালাম ভবানী ঘটককে। ভবানী উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করল আমার গানটির।”[৭০] জাতীয় উক্তির উচ্ছ্বাস একেবারেই রবীন্দ্রাবিষ্ট কথাচয়নগুলির জন্য খুব সংযত বা সঙ্গত নয়।

ডায়েরির বিনয় ভোরের প্রাতঃকৃত্য[৭১] থেকে শুরু করে গরমের দিনে একাধিকবার স্নান[৭২] থেকে কোলগেট টুথপেস্ট কেনা[৭৩], বরুণের দোকান ‘মেডি কেয়ার’ থেকে ওষুধ কেনা[৭৪], বিছানার চাদর কেনা[৭৫] অবধি তুচ্ছাতিতুচ্ছ সবকিছুই নথিবদ্ধ করেছেন ওই বছরটিতে। আবার একজন কবির পক্ষে না-উচিৎ ‘জাতিধর্মীয় শীৎকার’ (স্পর্শপ্রবণ নমঃশূদ্র-বিলাপ...)-ও এই সময়ের দু’একটি এন্ট্রিতে চলকে উঠছে—

১. “বৃষ্টি থামলে আমরা সবাই রেলওয়ে প্ল্যাটফর্মে গিয়ে দেখি...এসেছে।...ব্রাহ্মণ।...কে জানিয়েছি যে আমি শুদ্র [শূ]-নমঃশূদ্র।...”[৭৬]

২. “বিকালবেলায় বেড়াতে গিয়ে দেখা হল...এর সঙ্গে। ...ব্রাহ্মণ। আমার কবিতা পড়ে দিন পাঁচেক আর কিছু ভাবা যায় না, গুম মেরে বসে থাকতে হয় ঘরের ভিতরে, কোনো কাজও করা যায় না দিন পাঁচেক, আমার বই ‘ফিরে এসো, চাকা’ পড়লে — এইসব কথা...বলল। দেবদুলাল সাক্ষী।”[৭৭]

এখন এই ব্রাহ্মণ যে কে, সে-সম্পর্কে কোনও সংকেতচিহ্ন কবি দেননি। বিনয়কে নাগরিক বিস্মৃতির অতল থেকে তুলে আনার পবিত্র দায়িত্ব বিনয়জীবনের শেষ লগ্নে যিনি স্বেচ্ছায় নিয়েছিলেন, কবিতীর্থ প্রকাশনীর সেই প্রকাশক উৎপল ভট্টাচার্য হওয়া সম্ভব। কেননা, প্রথমত : উজ্জ্বল এই উদ্ধার যাঁর বদান্যতায় সম্পন্ন হবে তাঁর পক্ষে দীর্ঘ বরষমাসের একটা পরিচয় থাকা জরুরি, বিনয়ের সঙ্গে আশির দশকের এই পর্বেই হয়তো তাঁর আলাপ হয়ে থাকবে; এবং দ্বিতীয়ত : ‘সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার’ (২০০৫ খ্রিঃ) পাওয়ার পর দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে বিনয় উৎপলবাবুকে ‘ব্রাহ্মণ’ বলে চিহ্নিত করছেন—

“পিনাক : আপনি পুরস্কার পাবার সংবাদটা কীভাবে পেলেন?

বিনয় : ঐ, এক ব্রাহ্মণ আমাকে টেলিফোন করে বললো। আমার পাবলিশার।

স্নিগ্ধদীপ : কবিতীর্থ প্রকাশনী?

বিনয় : (একটু হেসে) হ্যাঁ। ঐ পাবলিশারকে দিল্লী থেকে টেলিফোন করেছে।”[৭৮]

পারিবারিকতাশূন্য কবি তখন কিন্তু আর সম্পূর্ণরূপে সমাজবিবর্জিত দিন কাটাচ্ছেন না। তিনি শহর ছেড়েছেন, অপরপক্ষে গ্রাম তাঁকে নিজের করতে পেরেছে। তাঁকে ঘিরে গড়ে উঠেছে

কাঁচা-নবীন এক পরিমণ্ডল। এঁদের মধ্যে কবি, সম্পাদক, কবিতাপ্রিয়— প্রত্যেকেই রয়েছেন; গতবসন্ত বিনয়কে যাঁরা প্রায় ঋষির আসনে বসিয়েছিলেন। এঁদের আত্মীয়তায় বিনয় পুনর্বার বেঁচে থাকার স্বাদ জানতে পারছেন, আবার এঁদেরই প্রবল স্তাবকতায় আস্তে-আস্তে হারিয়ে যাচ্ছে মহৎ কবিতাসম্ভাবনা। বিনয়ের সঙ্গে তাঁর সময়ের গুটিকয় কোলকাতার কবি, প্রাবন্ধিক, সাহিত্যপ্রতিষ্ঠানের কর্ণধার, সম্পাদক ইত্যাদির তখনও যোগাযোগ ছিলো, বিনয়ও যে সাম্প্রতিক সাহিত্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকার চেষ্টা করতেন আহূত দূরত্বে থেকেও, তার প্রমাণ ডায়েরিতে রয়েছে—

১. "আজ আলোক সরকার কবির আসার কথা। দুপুরে ঘুমোলাম। তার পরে কেরোসিন তেল আনলাম লণ্ঠনের জন্য। বিকাল পাঁচটায় আলোক সরকার এসেছিলেন আমার শিমূলপুরের বাড়িতে। স্থানীয় তরুণ কবিগণ ছিল — অমলেন্দু, পঙ্কজ, রণজিৎ, গৌরী, তাপস, সজল ছিল। দেবদুলাল মিনিট দশেক ছিল।"[৭৯]

২. "কালীকৃষ্ণ গুহকে চিঠি লিখলাম।"[৮০]

৩. "আজ লিটল ম্যাগাজিনস লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠাতা সন্দীপ দত্ত এসেছিল। তাঁর সঙ্গে ছিল অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। আমার কাব্যপুস্তিকা 'গায়ত্রীকে'-র নতুন সংস্করণ প্রকাশ করবে সন্দীপ — আমি রাজী হয়েছি। শৌনক এসেছিল। শৌনকও আমার একখানা কবিতার বই প্রকাশ করবে বলেছে।"[৮১]

৪. "শঙ্খ ঘোষের লেখা 'জার্নাল' বইখানি আমি দেখেছি গতকাল ১৭ই জুন। ভালো মূল্যবান বই।"[৮২]

৫. "আজ সারাদিন খুব খাটুনি গেছে। জীবনানন্দ প্রাসঙ্গিকী নামের একখানা বইয়ের ৭০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত পড়েছি। বইখানি বিচিত্র।..."[৮৩]

রাজনীতি হৃদয়ের ঊর্ধ্বে নয় বলে অবধিঅন্তিমে মানুষকেই মানুষের সুহৃদ্বর বলে মনে করছেন কবি। তাই "মানুষে মানুষে ঝগড়াঝাটি কোনোদিন থামবে না — মানুষে মানুষে না লিখে দেবতায় দেবতায় ঝগড়া কোনোদিন মিটবে না, চলতেই থাকবে ঈশ্বরে ঈশ্বরে ঝগড়া। আমার ভাষায়, চলমান জ্যামিতিগুলি পরস্পর ঝগড়া করতেই থাকবে। এ ঝগড়া থামাবার চেষ্টা করা বৃথা।"[৮৪] বলেও বলেন "লোকজনদের দেখি। লোকজন দেখতে আমার ভালো লাগে"[৮৫]।

এদিকে, অক্ষরিক অর্থেই বিনয়ের কবিতাযাপন এ-পর্যায় থেকে শুরু হয়। একটা প্রমাণ-ব্যাসার্ধের অন্তর্বর্তী অঞ্চলের উদীয়মান কবিদের ফ্রেন্ড, ফিলোসফার ও গাইডে পর্যবসিত হন তিনি। বস্তুত, এর আগে কখনও এতটা কবিতায় বাস তাঁর করা হয়ে ওঠেনি। অনুজ-অনুজতর-

অনুজতম এই কবিতাপ্রয়াসীর দল তাঁদের প্রিয় কবি-প্রিয় মানুষ বিনয় মজুমদারকে কবিতা, শুধু কবিতার হর্ম্যতলে এণাসন দিয়েছে। তরুণদের কবিতা মনোযোগ দিয়ে শুনছেন একজন প্রাজ্ঞ কবি, মন্তব্য করছেন, সুপরামর্শের আলোক দিচ্ছেন, তাদের বইপ্রকাশের পরিকল্পনায় উৎসাহ জোগানো থেকে উদ্যোগ পর্যন্ত নিচ্ছেন , নিজে কবিতা পাঠে অংশ নিয়ে ব্যবহারিক দিক থেকে তা ব্যাখ্যা করে শোনাচ্ছেন— অধুনাবিরল এই দৃশ্য তখন শিমুলপুরের নিত্যচিত্র। উদাহরণ :

১. "...পঙ্কজ এল অফিস ফেরৎ। পঙ্কজ আর আমি চা খেলাম একসঙ্গে। পঙ্কজের লেখা কবিতা পড়ে আমাকে শোনালো পঙ্কজ।"[৮৬]

২. "...দেবদুলালের মিষ্টির দোকানে বসলাম, খানিকক্ষণ কবিতা আলোচনা করলাম,..."[৮৭]

৩. "...আমি আজ সারাদিনে বেশি কথা বলিনি। সারাদিনে গোটা পঞ্চাশ বাক্য বলেছি মাত্র। তরুণ কবিগণ কবিতা পড়ছিল আমি একটু দূরে মাঝে মাঝে শুনছিলাম, কথা বিশেষ বলি নি।"[৮৮]

৪. "ভোরে দেবদুলালের মিষ্টির দোকানে বসে তরুণ কবিগণ আমাকে একখানা পত্রিকা দেখাল। ঢাকা-য় ছাপা, সম্পাদিত 'একবিংশ' নামে পত্রিকায় আমার সম্বন্ধে লিখেছে দেখাল। আমার কবিতা চাইল রণজিৎ, চারটে কবিতা চাইল।"[৮৯]

৫. "...। মুখে মুখে কবিতা রচনা করে শোনালাম তরুণ কবি কয়েকজনকে।"[৯০]

৬. "আজ ফল্গু বসু আসার কথা। ভালো ছন্দে কবিতা লেখে ফল্গু।"[৯১]

৭. "বিকালবেলা আমার প্রায় সব স্থানীয় শিষ্যরা ছিল এবং বনগাঁ থেকে ভবানী ঘটকও এসেছিল। খুব সুন্দর সাহিত্য আলোচনা হল।"[৯২]

৮. "পশ্চিমবঙ্গের কবির সংখ্যা খুব বেড়েছে। ওই কবিদের সঙ্গেই আড্ডা দিই সাধারণত।"[৯৩]

৯. "...তাপস এসেছিল। বয়স ১৬/১৭ বছর হবে। তাপস দিনপঞ্জী লেখে। কবিতা লেখে।"[৯৪]

১০. "...দেবদুলাল মিস্ত্রী আমাকে দুটি স্বরচিত কবিতা পড়ে শোনালো। আমি আমার পুরোনো তত্ত্ব কথা মুখে মুখে কিছু শোনালাম।"[৯৫]

১১. "মামার ছেলে নীহারের কবিতার বই কী ভাবে ছাপা যায় সেই আলোচনা করলাম।...বৃন্দাবনের কবিতার বইখানি 'ভাঙে ঘর ভাঙে ভালোবাসা' নিয়ে গোটা কয়েক ভবিষ্যদ্বাণী করলাম আমি।"[৯৬]

১২. "...ভোরে রণজিৎ হালদার আমাকে 'প্রিয় মেঘদূত' পত্রিকাখানি দিয়েছে। লালমোহনের কবিতা (প্রিয় মেঘদূতে) বেশ হয়েছে। তরুণ কবিদের শব্দ ব্যবহার খুব অসংলগ্ন হচ্ছে আজকাল। দোষ দেয় পাঠককে যে পাঠক কিছু বোঝে না, আমি কিন্তু আমার বিয়াল্লিশ বছর কবিতাচর্চার অভিজ্ঞতা থেকে জানি তরুণ কবিরা যখন লেখে তখন নিজেরাই বোঝে না কী লিখেছে। এইভাবে সাম্প্রতিকতম কবিদের মনের ভিতরে বহু চিন্তা অস্পষ্ট, অসম্পূর্ণ, অসংলগ্ন। এদের ভাবনার বিভিন্ন অংশ বয়স বাড়লে পরস্পর যুক্তিযুক্ত হবে। এই বয়সে আসলে পৃথিবীর কিছুই ভালোভাবে বোঝে নি, বয়স বাড়লে বুঝবে, তখন এদের কবিতা সযৌক্তিক হবে। তবে অল্প কবির চিন্তার যৌক্তিকতা আছে।"[৯৭]

১৯৮৮-র ডায়েরি থেকে সে-দিনগুলির আরও বেশ কিছু তথ্য মিলছে, এর মধ্যে নিরীহ নিরামিষ তথ্যও যেমন আছে, তেমনই রয়েছে বহু আকর্ষক তথ্যও। বাড়ির ঠিকে কাজের জন্য পলাশী[৯৮] ও রান্নার জন্য সরস্বতী[৯৯] নাম্নী দু'জন মহিলাকে ঠিক করেছিলেন বিনয়। এদের কাজে যোগ দেওয়ার দিন, মাইনে দেওয়া, বাকি-র একটি পাতাজোড়া হিসেবপত্র পাওয়া গেছে ডায়েরির Personal Memoranda চিহ্নিত অংশটিতে[১০০]। পরের দিকে তাঁর নৈমিত্তিক খাদ্যের তালিকা ছিলো প্রায় সাত্ত্বিক : ভাত আর সব্জির মধ্যে গোলআলু, ঝিঙে, পেঁয়াজ, পেঁপে, কাঁচকলা, ঢ্যাঁড়শ— এর থেকে একত্রে দু'টি বা তিনটির সেদ্ধ।[১০১] একবার তাঁকে ৺অমূল্য মামার ছেলে সুবোধের কাছে ভালো ঘিয়ের প্রত্যাশায় আবদ্ধ হতে দেখি[১০২]। এ কি চার্বাকপন্থীর বিলাস? নাকি বছরের পর বছর সেদ্ধ খাবার খেয়ে যাওয়ার অরুচির তুলাসামান্য আয়ুধ! রবীন্দ্রজন্মদিবসে আয়োজিত এক সভায় কিংবা কোনও রবীন্দ্র-নজরুল সন্ধ্যায় প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করে রবীন্দ্রনাথ বিষয়ক প্রশংসাবাচক বক্তৃতা দিয়ে তিনি তৃপ্ত হন, এমনকী, পুরস্কার হিসেবে একটি ঝোলা পাওয়ার কথাও ডায়েরিতে লিখে রাখেন[১০৩]; ভূতলে ব্যাপ্ত চরাচরের প্রতি তাঁর প্রীতি কবি অনেকবার অনেক কবিতায় লিখেছেন— বাস্তবিকই তিনি একটি রবাহূত বিড়ালকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে পাঁউরুটি খাওয়াচ্ছেন— তাঁর ডায়েরিতে এমন দৃশ্যও রয়েছে[১০৪]। আবার, বৈশাখ মাসের শেষে একজনকে পাকা আম খেতে দেখে তিনি জাগতিক নিত্যসত্যচক্রের পূর্ণতা খুঁজে পাচ্ছেন যেন[১০৫]। 'সুরঞ্জনা' পত্রিকায় তাঁর প্রকাশিত চারটে কবিতা তাপস পড়ে শোনালে বিনয় লেখেন— "এটা এখন প্রতিষ্ঠিত সত্য যে আমি মহাকবি বেদব্যাসের সমান কবি।"[১০৬]; কিন্তু এই অযাচিত অতিকথনের প্রয়োজন কেন পড়লো বিনয়ের? তাঁর বিদিত মনোবিকলন কি তবে পুনরায় গুপ্তহত্যায় মেতেছে? এর দিন দশেক পরে লেখা ডায়েরির পাতায় পাওয়া যাচ্ছে তাঁর মনোচিকিৎসকের দ্বারস্থ হওয়ার ঘটনাটি। ঘটনাচক্রে, কবি কোলকাতার টেমার লেনে সন্দীপ দত্ত-প্রতিষ্ঠিত 'লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার'-এর দশকপূর্তির অনুষ্ঠান উপলক্ষে আমন্ত্রিত ছিলেন। বিনয় লিখছেন—

“আজ গেছলাম কলকাতায়। প্রথমে মনস্তত্ত্ববিদ হরিরঞ্জন গাঙ্গুলীর কাছে। তারপরে বিকাশ বাগচী মশায়ের কাছে গেলাম সিগনেট বুক শপে। সেখান থেকে টেমার লেনে সন্দীপ দত্তর বাড়িতে। সন্দীপ-এর মা-কে দেখলাম। দুপুরে খেলাম সন্দীপের বাড়িতে। তার পরে শুয়ে পৌনে চারটে পর্যন্ত বিশ্রাম। তারপর একতলায় সন্দীপেরই লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরীতে নেমে এলাম। অনেক তরুণ কবি ছিলেন সেখানে। তার পরে সাড়ে পাঁচটায় লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরির দশ বছর পূর্তি উৎসবের সভায় স্টুডেন্টস্ হল-এ। অনেক জানাশোনা লোকের সঙ্গে দেখা হল। অনেককেই তিরিশ বছর ধরে চিনি — যেমন আমার প্রকাশক দেবকুমার বসু মশায়। অজিত পাণ্ডে নীলাদ্রি আরো কত পরিচিত জন। বক্তৃতা দিতে উঠে সন্দীপ অশ্রুমোচন করল লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরীর কথায়।”[১০৭]

বিনয়ের নিজের কবিতা লেখবার সরাসরি উল্লেখ রয়েছে ডায়েরির মাত্র দু'জায়গায় : “চা রুটি খেতে গিয়ে অন্ধ রূপচাঁদ বৈরাগীর সঙ্গে দেখা। তাকে বললাম— রূপচাঁদ, তোমাকে নিয়ে আমি একটি কবিতা ভেবেছি বহু দিন আগে থেকে। আজ গিয়ে তাই লিখি। বাড়িতে এসে রূপচাঁদকে নিয়ে লিখলাম একটি কবিতা।”[১০৮] ও “আজকে অবশ্য কবিতা লিখেছি একটি।”[১০৯] কবি একবার চিকিৎসার জন্য একাই ঠাকুরনগর ট্রেনে শিয়ালদা হয়ে হেঁটে হেঁটে মেডিকেল কলেজে পৌঁছলেন। এই এন্ট্রিতে ডাক্তার দেবানন্দ সাহা এবং ভক্তি হরি গাংগুলির নামোল্লেখ পাই।[১১০] ভক্তি হরি গাংগুলি আর হরিরঞ্জন গাঙ্গুলী এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হতে পারে। কবির ডায়েরি থেকে পাওয়া সবচে' কৌতূহলোদ্দীপক এন্ট্রি দু'টি :

১. “সারাদিন আমার যায় টাকার চিন্তায়— অথচ টাকা আমার আছে যথেষ্ট।”[১১১]

২. “কাল ভোরে খবর পাব একটি গোপন বিষয়ে।”[১১২]

প্রথমটি সত্যভাষ না হেঁয়ালি ধারণা করার উপায় নেই। তবে বিনয়ের মনে পৈতৃক সম্পত্তির বেদখল হওয়ার মতো একটা সন্দেহকে ক্রমায়ত আমরা অবয়ব পেতে দেখবো এই সময় থেকেই। দ্বিতীয়টিতে উল্লিখিত ‘কাল’ অর্থাৎ ১৯৮৮-র জুনপয়লা বিনয়ের ডায়েরিতে এন্ট্রি রয়েছে— বেশ খানিক তথ্যসমাচারও। কিন্তু, চাঞ্চল্যকর গোপন খবর বলে এর মধ্যে কোনওটিকেই মনে হচ্ছে না, এটাই সমস্যা!

তাঁর ডায়েরিতে দিনলিপির আকারে লিখিত তারিখবিহীন দু'টি বিচ্ছিন্ন লেখার সন্ধান মিলছে। এর দ্বিতীয়টি কবির বিশেষ মনোমুহূর্তের ফসল, সেই বহুদিনের নারীজনিত বিভ্রম ফের তাঁর ব্যাকুল মনের ভাবনায় ডানা মেলছে—

“দুপুরবেলা আঁধার করে বৃষ্টি এল। আমি বিছানায় শুয়ে রবীন্দ্র-রচিত বর্ষামঙ্গল গাইছিলাম।

হঠাৎ একটি যুবতী আমার ঘরে ঢুকে পড়ল। আমি দেখলাম। আমি বুঝতে পারলাম না, কি রকমভাবে এলো, কেন এলো আমার কাছে। আমি পাশ ফিরে শুয়ে থাকলাম। ভাবতে লাগলাম কোনো রবীন্দ্রসংগীতের আত্মীয়া কিনা। সেই প্রাসাদের শিখরের এলোকেশীকে কতবার দেখেছি এই গ্রামে কিংবা সেই হরিণনয়না কন্যা, তার কালো ধেনুর খোঁজে আমার ঘরে অবধি ঢুকে আসে : 'দিনশেষ হয়ে এল, আঁধারিল ধরণী' — এখন আমি কি করি। তুমি কে এসেছো আজ এতদিন পর আমার সঙ্গে খেলা করতে — ভাবতে ভাবতে আবার বৃষ্টি নামল। আমি দেখতে পারছি, অপরিচিতা আমার কাছেই এগিয়ে আসছে বর্ষার গানের থেকে বেরিয়ে — জিজ্ঞেস করল — 'বিনয়দা ঘুমোচ্ছেন?'"[১১৩]

অকস্মাৎ গৃহপ্রবিষ্ট ভ্রমরের দিনিলিপি নয়, এ-বরং বিনয়কে জন্মযাপনের কাঁটাকলে নিঃশেষে তাড়িয়ে ফেরা কেন্দ্রাতিগ চেতনার বুনো মোষের প্রাদুর্ভাব, বিনয়ের মোমঘুম ও অসাধারণ একটি গদ্যস্থাপত্যের স্থাপনা।...

তথ্যসূত্র :

১. বিনয় মজুমদার; '১,২,৩,৪,...সংখ্যার থেকে বিযুক্ত ঊর্ধ্বগতি' (২৪/১০/৮৬-তে লিখিত); বিনয় মজুমদারের ডায়েরি, (সম্পা.) অজয় নাগ, কমল মুখোপাধ্যায়; শিলীন্ধ্র প্রকাশন, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ : জানুয়ারি ২০০৬, কলকাতা পুস্তকমেলা; কলকাতা ৭০০ ০৯০; পৃ . ১০৬

২. 'শিমূলপুর', 'শিমুলপুর'— উভয় বানানই বিনয়ের নামাঙ্কিত রচনায় প্রযুক্ত হতে দেখা যায়। তাঁর ডায়েরির পাতায় সর্বত্র 'শিমূলপর' বানানটি অনুসৃত হয়েছে। আবার 'শিমুলপুরে লেখা কবিতা' নামের বইটিতে 'শিমুলপুর' বানানটি রয়েছে। যদিও 'শিমুল' ও 'শিমূল' [বি. শাল্মলী বৃক্ষ ও পুষ্প] দু'টি বানানই শুদ্ধ বলে অভিধানকার জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস মহাশয় জানাচ্ছেন।

দ্র. জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, 'বাঙ্গালা ভাষার অভিধান', [দ্বিতীয় ভাগ (ন-হ)]; সাহিত্য সংসদ, নবম মুদ্রণ : জুলাই ২০১০, কলকাতা – ৭০০ ০০৯, পৃ. ১৯৪৫

৩. বিনয় মজুমদার; '৯ চৈত্র, ১৩৯০ শিমূলপুর'; বিনয় মজুমদারের ডায়েরি, (সম্পা.) অজয় নাগ, কমল মুখোপাধ্যায়; শিলীন্ধ্র প্রকাশন, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ : জানুয়ারি ২০০৬, কলকাতা পুস্তকমেলা; কলকাতা ৭০০ ০৯০; পৃ. ৩৫

৪. ঐ; '১০ চৈত্র, ১৩৯০ শিমূলপুর'; ঐ

৫. উদ্ধৃত অংশ :

"শব্দ শুনে বুঝছি যে বৃষ্টি হচ্ছে। রাত্রিবেলা ঘরে বসে আছি।

আমার পাশে কেলোর মাতা তার পাশে কেলো।"

দ্র. ঐ; '১০ চৈত্র, ১৩৯০ শিমূলপুর'; ঐ

৬. ঐ; '১৩ চৈত্র, ১৩৯০ শিমূলপুর'; ঐ, পৃ. ৩৭

প্রসঙ্গত, বিনয়ের 'বাল্মীকি'-উত্তর পর্বের একটি কাব্যগ্রন্থের নাম 'আমাদের বাগানে' (সিলভান পাবলিকেশনস; প্রথম প্রকাশ : ৩১ শে ভাদ্র, ১৩৯১; কলকাতা : ৭০০০১২)

৭. ঐ; '১৫ চৈত্র, ১৩৯০ শিমূলপুর'; ঐ, পৃ. ৩৮

৮. ঐ; '১৭ চৈত্র, ১৩৯০ শিমূলপুর'; ঐ, পৃ. ৩৯

৯. ঐ; '২২ চৈত্র, ১৩৯০ শিমূলপুর'; ঐ, পৃ. ৪৩

১০. ঐ; '২৪ চৈত্র, ১৩৯০ শিমূলপুর'; ঐ, পৃ. ৪৫

১১. ঐ, ২ আষাঢ় ১৩৯১ শিমূলপুর, ঐ, পৃ. ৪৭

আষাঢ়-শুরুর দিনে লেখা একটি ও আষাঢ় মাসনামে লেখা আরও দু'টি কবিতা অবশ্য বিনয়ের 'আমাদের বাগানে' কাব্যগ্রন্থে রয়েছে।

দ্র. ঐ; 'পয়লা আষাঢ়ে আজ'; (কা.গ্র. 'আমাদের বাগানে'); কাব্যসমগ্র (দ্বিতীয় খণ্ড); প্রতিভাস; (সম্পা.)

শ্রীতরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়; প্রথম প্রকাশ : ১লা বৈশাখ ১৪০৯, এপ্রিল ২০০২; কলকাতা-২; পৃ. ৭৭

দ্র. ঐ, 'বিগত আষাঢ় মাসে', ঐ, পৃ. ৯৩

এছাড়াও আষাঢ় মাসের নামোল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে তাঁর 'আমি এই সভায়' কাব্যগ্রন্থের একটি কবিতায়। লক্ষনীয়ভাবে, এই কাব্যগ্রন্থটির প্রথম প্রকাশকাল ১৩৯১ বঙ্গাব্দ (১লা মাঘ)। কবিতাটিতে, বৃষ্টি ও বৃষ্টিবিরাম এবং শয্যায় স্বপ্নাবর্ত তৈরি... বিনয় নিশিযাপনে (night out) নিজেকে প্রস্তুত করেন—

"আষাঢ়ের দ্বিতীয়ার্ধে আবহাওয়া মনোরম হয়েছে ক্রমশ।

তেমন উত্তাপ নেই, বরং বসন্তকাল ব'লে মনে হয়।

....

আজকে এ রাত্রিবেলা শয্যায় ঘুমোবো আর স্বপ্নও দেখবো।

শুধু স্বপ্ন দেখবার জন্য অনুকূল এই আমার শয্যার আবহাওয়া।"

(খণ্ডিতাংশ)

দ্র. ঐ, 'আষাঢ়ের দ্বিতীয়ার্ধে', (কা.গ্র. 'আমি এই সভায়'), ঐ, পৃ. ১০৯

১২. ঐ, ১৮ ভাদ্র ১৩৯১ শিমূলপুর, ঐ, পৃ. ৪৮

১৩. ঐ; '৯ অগ্রহায়ণ ১৩৯১ শিমূলপুর'; ঐ, পৃ. ৪৬

'তৈল' অর্থাৎ কিনা 'তেল' শব্দটি নিঃসন্দেহে প্রতীকী। বিনয়ের অনুজ আধুনিক এক কবি এই শব্দটির ব্যাঞ্জনাময় প্রয়োগ ঘটিয়েছিলেন তাঁর একটি কবিতায়। খণ্ডিতাংশ :

"সন্ন্যাসীরা বলেছিলো, কিন্তু সংসারে গাজনের মেলার কোনো

প্রতিচ্ছবি নেই; তাই গৃহস্থরা, সন্ন্যাসীরা ওরকম বলে-টলে এই ব'লে

জড়িয়ে পড়েছিলো গার্হস্থ্যে, প্রেম প্রীতি সাফল্যের

মধুর সংঘর্ষে, লেনদেনে, শতাংশের সুবিধাজনক লগ্নী ব্যবসায়ে;

প্রদীপের পাশাপাশি তারা সব একে একে

তেল ঢালবার জন্য বংশধর তৈরি ক'রে গেলো; দিনযাপনের সূঁচে

তারা জীবনকে উপহার দিলো বর্ণহীন টুইলের শার্ট,

তারপর ঝড় এসেদ লণ্ডভণ্ড ক'রে দিলো মানুষের মুখের আদল;

দেখা গেলো সবাই সন্ন্যাসী; সমস্ত পৃথিবী জুড়ে ব'সে গেছে

অফুরান গাজনের মেলা;..."

দ্র. ব্রত চক্রবর্তী, 'গাজনের মেলা', (কা.গ্র. 'গাজনের মেলা'), শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ : কলকাতা পুস্তকমেলা জানুয়ারি ২০০২ | মাঘ ১৪০৮, কলকাতা – ৭০০ ০৭৩, পৃ. ৯

১৪. ঐ, ১৫ অগ্রহায়ণ ১৩৯১ শিমূলপুর, ঐ, পৃ. ৪৬

১৫. ঐ; '২০ শ্রাবণ, ১৩৯৪/ কলকাতা মেডিকেল কলেজ'; ঐ, পৃ. ৪৯

১৬. ঐ; '২০ শ্রাবণ, ১৩৯৪ বঙ্গাব্দ/ কলিকাতা'; ঐ; পৃ. ৫০

১৭. ঐ; '২০ শ্রাবণ, ১৩৯৪'; ঐ; পৃ. ৫১

১৮. ঐ; 'যুদ্ধ'; বিনয় মজুমদারের ছোটগল্প; কবিতীর্থ; দ্বিতীয় সংস্করণ : জানুয়ারি, ২০১১; কলকাতা-২৩; পৃ. ৯৭-৯৯

১৯. মোহিতলাল মজুমদার; 'কাল-বৈশাখী'; (কা.গ্র. 'হেমন্ত-গোধূলি'); মোহিতলাল মজুমদারের কাব্যসংগ্রহ; (সম্পা.) ভবতোষ দত্ত; ভারবি; প্রথম প্রকাশ : পৌষ ১৪০৪, ডিসেম্বর ১৯৯৭; কলকাতা-৭৩; পৃ. ৩৮৫

২০. বিনয় মজুমদার; '২১ শ্রাবণ, ১৩৯৪ কলকাতা/ পৃথিবী'; বিনয় মজুমদারের ডায়েরি, (সম্পা.) অজয় নাগ, কমল মুখোপাধ্যায়; শিলীন্ধ্র প্রকাশন, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ : জানুয়ারি ২০০৬, কলকাতা পুস্তকমেলা; কলকাতা ৭০০ ০৯০; পৃ. ৫১

২১. ঐ; '২২ শ্রাবণ, ১৩৯৪ বঙ্গাব্দ, কলকাতা; ঐ, পৃ. ৫২

২২. ঐ; '২২ শ্রাবণ, ১৩৯৪ বঙ্গাব্দ, কলকাতা'; ঐ, পৃ. ৫৫

২৩. ঐ, '২৩ শ্রাবণ', ঐ, পৃ. ৫৬

২৪. ঐ; '২২ শ্রাবণ, ১৩৯৪/ কলকাতা'; ঐ; পৃ. ৫৩

এই স্বলিখনের আট বছর পর প্রকাশিত একটি কাব্যগ্রন্থের একটি কবিতায় কবি বিনয়কে যুদ্ধবিরোধী অবস্থানে দেখতে পাচ্ছি। কবিতায় প্রত্যক্ষ রাজনীতিকতা (direct political stance) সে-অর্থে যদিও ঈশ্বরীমুগ্ধ কবি বিনয়ের স্টাইল (style) নয়। তাঁর কবিতায় উচ্চাঙ্গের মানবীয় দর্শন রয়েছে, রয়েছে মানবতার মূর্ততা, বিদ্রূপ ও বিক্ষোভের নিশানদারি একেবারে নেই বললেই চলে। বন্দুকের শত্রুতালিকে তিনি ঠ্যাকাচ্ছেন প্রেমের টফি ও গোলাপে। ব্যতিক্রম নিম্নোক্ত কবিতাটি :

"কে বলে আমরা সব পশুর চেয়েও বেশি অসভ্য ইতর?

দ্যাখো এক বোমা ফেলে এক লক্ষ মানুষ মেরেছি।

এত বড়ো বৈজ্ঞানিক আমরা সকলে মাসে এক লক্ষ টাকা

বেতন পাই তো আমি। তোমার বেতন মাসে দুহাজার টাকা।

তোমরা বানাও দেখি এরকম বোমা যাতে দুহাজার মানুষ মরবে।

পারো না বানাতে ফলে তোমরা কিছুই নও, সভ্য আমরাই।

মানুষের বিদ্যাবুদ্ধি এত বেশি বাড়িয়ে ফেলেছি।

তোমরাই অশিক্ষিত সেহেতু শান্তির বুলি আওড়াও ব'সে।"

দ্র. ঐ, 'কে বলে আমরা সব', (কা.গ্র. 'আমাকেও মনে রেখো'), কাব্যসমগ্র (দ্বিতীয় খণ্ড); প্রতিভাস; (সম্পা.) শ্রীতরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়; প্রথম প্রকাশ : ১লা বৈশাখ ১৪০৯, এপ্রিল ২০০২; কলকাতা-২; পৃ. ১৪৮

আবার, উত্তরকালের কবি জয় গোস্বামীর বিখ্যাত একটি কবিতায় উচ্চারিত একটি জিজ্ঞাসার সঙ্গে বিনয়ের এই ব্যঙ্গোক্তিটির মিল পাই—

"তুমি কত সালে জন্মেছ বিজ্ঞানী?

কত আলে তুমি জন্মেছ হে শাসক?

তোমাদের ঘরে ছেলেপুলে জন্মেছে?

ঠিক ঠিক আছে নাক মুখ হাত চোখ?"

(খণ্ডিতাংশ)

দ্র. জয় গোস্বামী, 'মা নিষাদ', মা নিষাদ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, দ্বিতীয় মুদ্রণ মে ২০০৩, (উৎ. শক্তি চট্টোপাধ্যায়), (ছবি : শুভাপ্রসন্ন), কলকাতা ৯, পৃ. ৪১

২৫. নির্মলেন্দু গুণ; 'যুদ্ধ'; প্রকৃতি ও প্রেমের কবিতাসমগ্র; মাওলা ব্রাদার্স; ষষ্ঠ মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারি ২০১৩; ৩৯/১ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০, পৃ. ১৫৮

২৬. দ্র. বিনয় মজুমদার, '২৪ শ্রাবণ', বিনয় মজুমদারের ডায়েরি, (সম্পা.) অজয় নাগ, কমল মুখোপাধ্যায়; শিলীন্ধ্র প্রকাশন, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ : জানুয়ারি ২০০৬, কলকাতা পুস্তকমেলা; কলকাতা ৭০০ ০৯০; পৃ. ৫৮;

দ্র. ঐ, '২৪ শ্রাবণ', ঐ, পৃ. ৫৯;

দ্র. ঐ, '২৪ শ্রাবণ', ঐ, পৃ. ৬০;

দ্র. ঐ; '২৫ শ্রাবণ, ১৩৯৪ কলিকাতা'; ঐ; পৃ. ৬২

দ্র. ঐ, 'শ্রাবণ ১৩৯৪ কলকাতা'' ঐ, পৃ. ৬৮

দ্র. ঐ, 'শ্রাবণ ১৩৯৪ কলিকাতা', ঐ, পৃ. ৬৮

দ্র. ঐ, 'শ্রাবণ ১৩৯৪ শিমূলপুর', ঐ, পৃ. ৬৯

বিনয় তাঁর ডায়েরিতে খেয়ালেই হয়তো বা 'কলকাতা', 'কলিকাতা'— শব্দটির প্রাচীন, অর্বাচীন দুই রূপ ব্যবহার করে থাকবেন।

২৭. দ্র. ঐ, '২৪ শ্রাবণ', ঐ, পৃ. ৬০

২৮. একাকিতা বুদ্ধিজীবীর নিরন্তর নোটবই। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'-র 'বোধ' কবিতায় জীবনানন্দ দাশ কবির দর্শন-

একান্তিকা লিখেছেন এইভাবে—

"সকল লোকের মাঝে ব'সে

আমার নিজের মুদ্রাদোষে

আমি একা হতেছি আলাদা?

আমার চোখেই শুধু ধাঁধা?

আমার পথেই শুধু বাধা?"

দ্র. জীবনানন্দ দাশ; 'বোধ'; (কা.গ্র. 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'); শ্রেষ্ঠ কবিতা; ভারবি; দশম মুদ্রণ : শ্রাবণ ১৪১০, আগস্ট ২০০৩; কলকাতা-৭৩; পৃ. ১৯

আবার, শক্তি চট্টোপাধ্যায় একটু অন্যভাবে লেখেন—

"কেন অবেলায় যাবে? বেলা হোক, ছিন্ন করে যেও

সকল সম্পর্ক! যেন গাছ থেকে লতা গেছে ছিঁড়ে

একটি বিষণ্ণ লোক থাকে যেন হাস্যময় ভীড়ে

কেন অবেলায় যাবে? বেলা হোক, ছিন্ন করে যেও

সকল সম্পর্ক"

দ্র. শক্তি চট্টোপাধ্যায়; 'কেন?'; (কা.গ্র. 'ভালোবেসে ধুলোয় নেমেছি'); শ্রেষ্ঠ কবিতা; দশম সংস্করণ : ১৪১০ ফাল্গুন, ফেব্রুয়ারি ২০০৪; ক ল কা তা ৭ ০ ০ ০ ৭ ৩; পৃ. ১৬৯

সুব্রত চক্রবর্তী লেখেন—

"সকলে ভ্রমণ শেষে ঘরে ফেরে — একজন কখনো ফেরে না ।

অনন্ত প্রবাস তার নদীতীর, সমাধিভূমির ভাঙা মর্মরছায়ায়...

অনন্ত প্রবাস তার অবিশ্বাসে, দুঃখে-সুখে, যুদ্ধহীন জয়ে-পরাজয়ে...

সকলে ভ্রমণ শেষে ঘরে ফেরে— একজন কখনো ফেরে না ।

আজন্ম-বিদেশি ওই মানুষের পুরোনো রুমালে

কোনো করস্পর্শ নেই, স্মৃতি নেই, নেই কোনো রঙিন অক্ষর ।

মানুষ ছুটির শেষে ঘরে ফেরে নিয়ে কত মজার পুতুল,

ভ্রমণকাহিনি, ফোটো, মোহময় গন্ধে ভরা উলের মাফলার —

একজন সামান্য লোক ঘরে থাকে, একা-একা নিজের মতন ;

অনন্ত প্রবাস তার এই ঘর —

এই ঘরে ঝরনাশব্দ ভেসে আসে, ছায়া দেয় দীর্ঘ শাল, ওঁরাও যুবতী

গান গায় খিন্নস্বরে। এই ঘরে সে কি বন্দি! পর্যটক নয় !

দ্র. সুব্রত চক্রবর্তী, 'সামান্য মানুষের গল্প' (কবিতা এক); (কা.গ্র. 'নীল অপেরা'); কবিতাসংগ্রহ; পরম্পরা প্রকাশন; প্রথম প্রকাশ : আগস্ট, ২০১৫; কলকাতা ৭০০ ০০৯; পৃ. ৯৭

এই যে 'আমি' কিংবা বাধ্যতার হাসিখেলায় মিশে থাকা এই যে 'বিষণ্ণ' বা 'সামান্য' লোকটি— আদপে এ-ই তো ভালোবেসে ধুলোয় নেমে আসা শিল্পীর নাম-পরিণাম।

২৯. দ্র. ঐ, '২৫ শ্রাবণ, ১৩৯৪ কলিকাতা', ঐ, পৃ. ৬১

গায়ক-গানলেখক সুমন চট্টোপাধ্যায় ওরফে কবীর সুমন তাঁর বিখ্যাত একটি গানে লিখেছিলেন—

"ছলাৎছল ছলাৎছল ছলাৎছল
ঘাটের কাছে গল্প বলে নদীর জল।

আদ্যিকাল শ্যাওলা হ'ল ঘাটের গায়
ভূতের মতো চার্নকের নৌকো যায়
নদীর ধারে বসবে বুঝি পাটের কল।

পাটের কলে মানুষ ফেলে মাথার ঘাম
পরের ঘামে মালিক জপে টাকার নাম
ঘামের জলে নৌকো চলে দেখবি চল্।

নৌকো ছিল নৌকো আছে নৌকো যায়
কাদের ঘাম শ্যাওলা হ'ল ঘাটের গায়

বল্ না নদী   তাদের কিছু   গল্প বল্—

ছলাৎছল   ছলাৎছল   ছলাৎছল।।”

দ্র. কবীর সুমন, ‘নদীর গল্প’; সুমনের গান (দ্বিতীয় সংকলন); সপ্তর্ষি প্রকাশন; প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০০৭; শ্রীরামপুর, হুগলী; পৃ. ৭১

৩০. বিনয় মজুমদার, ‘২৪ শ্রাবণ’, বিনয় মজুমদারের ডায়েরি, (সম্পা.) অজয় নাগ, কমল মুখোপাধ্যায়; শিলীন্ধ্র প্রকাশন, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ : জানুয়ারি ২০০৬, কলকাতা পুস্তকমেলা; কলকাতা ৭০০ ০৯০; পৃ. ৫৯

ধর্মগত অসহন এ-মুহূর্তের বিশ্বব্যাধি। বিনয়ের কবিতা সেক্ষেত্রে আলোকদিশারী হতেই পারে—

উদা. (ক)

“মন্দিরেও আবর্জনা জমে বহু প্রতিদিন দেখি।

সেইসব আবর্জনা আমার হৃদয় থেকে ঝাঁট দিয়ে বার করি আমি।

যেন শিশু সেইসব আবর্জনা নিয়ে খেলা করি;

যেন বা সেই পূজারী সেই আবর্জনা মেখে নিই আমার ললাটে;

যেন পাখি আবর্জনা নিয়ে যায় বাসা বাঁধবার

নিমিত্ত, এসব আমি নিজেই করছি বর্তমান

মুহূর্তেই, এইসব আবর্জনা পচে ক্রমে মাটি হয়ে যাবে।

হয় তো বা সেই মাটি দিয়ে কেউ ভবিষ্যতে দেবতা বানাবে।

দ্র. ঐ; ‘মন্দিরেও আবর্জনা’; (কা.গ্র. ‘আমাকেও মনে রেখো’); কাব্যসমগ্র (দ্বিতীয় খণ্ড); প্রতিভাস; (সম্পা.) শ্রীতরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়; প্রথম প্রকাশ : ১লা বৈশাখ ১৪০৯, এপ্রিল ২০০২; কলকাতা-২; পৃ. ১৫০

উদা. (খ)

“দেশে সাম্যবাদ এলে সকল মন্দির

ডিনামাইটের দ্বারা ভেঙে ফেলা হবে

আর যদি কেউ তার বিবাহের কালে

পুরোহিত ডেকে আনে মন্ত্র পড়বার

নিমিত্ত তাহলে তাকে যাবৎ জীবন

কারাদণ্ড দেওয়া হবে যথা ভগবান

নামক ব্যক্তিকে দাহ করা দরকার

হয়ে পড়ে একদিন অথবা যেমতি

অন্ধকারে বজ্রপাত প্রয়োজন হয়

মাঝে মাঝে মন ক্রমে মহীর মানুষ

সভ্যতা অসভ্যতর হয়েই চলেছে

এইভাবে মুহূর্তেই ভাবি মানুষের

গড় আয়ু বেড়ে যাচ্ছে—এ চিন্তা আমার

সান্ত্বনা আনত না মনে, আমি তো ভ্রান্ত না।”

দ্র. ঐ, ‘দেশে সাম্যবাদ এলে’, (কা.গ্র. ‘কবিতা বুঝিনি আমি’), ঐ, পৃ. ২২৪

এখানে বলার এটুকুই যে, বিনয় কিন্তু মন্ত্রের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো ব্লাসফেমিস্ট নন, তিনি যে-কোনওরকম তন্ত্রেরই বিপক্ষে। নচেৎ যৌবনে ‘সাম্যবাদী’ বলে ঘোষিত দলটি ছেড়ে কিছুদিনের মধ্যেই বেরিয়ে আসতে পারতেন না। শুধু তাই নয়, জীবনের আগুনসময়ে পার্টির অনুশাসন ছেড়ে এলেও অন্তকালে তিনি “আমি এক কমিউনিস্ট— এই কথা উচ্চারিত হোক/ দিকে দিকে পৃথিবীতে— এ আমার সঙ্গত কামনা।” উচ্চারণ করেছেন, তা অন্তত পদাধিকার অর্জন বা বিশেষ কোনও সুবিধেভোগের জন্য যে নয়; সে বলার অপেক্ষা রাখে না। আর যাই হোক ধান্দাবাজির বান্দা নন তিনি, কখনও ছিলেন না। দুঃসময় তাঁকে কাঁদাবে ভাবে, উল্টে তিনিই হাসিমুখে তাকে সবসময় কাঁদিয়েছেন, কাঁদান!

দ্র. ঐ, ‘কবিতার খসড়া/ ২৬’, (কা.গ্র. ‘বাল্মীকির কবিতা’), ঐ, পৃ. ৭৫

৩১. ঐ; ‘২৫ শ্রাবণ, ১৩৯৪ কলকাতা’; ঐ; পৃ. ৬১

৩২. নির্বাচিত অংশ :

“সবার মাঝে আমি ফিরি একেলা।

কেমন করে কাটে সারাটা বেলা।

ইঁটের ’পরে ইঁট,   মাঝে মানুষ কীট—

নাইকো ভালোবাসা, নাইকো খেলা।।”

দ্র. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; ‘বধূ’ (কা.গ্র. ‘মানসী’) (*১১ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৫। পরিবর্ধন। শান্তিনিকেতন।। ৭ কার্তিক*); সঞ্চয়িতা; বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, সংশোধিত পুনরমুদ্রণ জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৯, কলিকাতা ১৭, পৃ. ৭৭

৩৩. নির্বাচিত অংশ :

“ইঁটের-টোপর-মাথায়-পরা   শহর কলিকাতা

অটল হয়ে বসে আছে—   ইঁটের আসন পাতা।”

দ্র. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; ‘চলন্ত কলিকাতা’ (কা.গ্র. ‘চিত্রবিচিত্র’) (*শান্তিনিকেতন।। ৬ পৌষ ১৩৩৬*); সঞ্চয়িতা; বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, সংশোধিত পুনরমুদ্রণ জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৯, কলিকাতা ১৭, পৃ. ৭৫৯

৩৪. বিনয় মজুমদার; ‘২৫ শ্রাবণ, ১৩৯৪ কলকাতা’; বিনয় মজুমদারের ডায়েরি, (সম্পা.) অজয় নাগ, কমল মুখোপাধ্যায়; শিলীন্ধ্র প্রকাশন, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ : জানুয়ারি ২০০৬, কলকাতা পুস্তকমেলা; কলকাতা ৭০০ ০৯০; পৃ. ৬২

৩৫. ঐ; ‘২৫ শ্রাবণ, ১৩৯৪ কলকাতা’; ঐ; পৃ. ৬৩

৩৬. ঐ; ‘শ্রাবণ, ১৩৯৪ শিমূলপুর’; ঐ; পৃ. ৬৯

৩৭. ঐ; ‘২৫ শ্রাবণ, ১৩৯৪’; ঐ; পৃ. ৬৪

৩৮. ঐ; ‘২৫ শ্রাবণ, ১৩৯৪ কলিকাতা’; ঐ, পৃ. ৬৫

৩৯. ঐ; ‘২৫ শ্রাবণ, ১৩৯৪ কলিকাতা’; ঐ, পৃ. ৬৫

৪০. ঐ; ‘২৫ শ্রাবণ, ১৩৯৪ বঙ্গাব্দ, কলিকাতা’; ঐ; পৃ. ৬৬

৪১. ঐ; ‘২৬ শ্রাবণ, ১৩৯৪ কলিকাতা’; ঐ; পৃ. ৬৭

৪২. ঐ; ‘শ্রাবণ, ১৩৯৪ বঙ্গাব্দ, কলকাতা’; ঐ; পৃ. ৭২

৪৩. ঐ; ‘শ্রাবণ, ১৩৯৪ বঙ্গাব্দ, কলকাতা’; ঐ; পৃ. ৭২

৪৪. ঐ; ‘শ্রাবণ, ১৩৯৪ বঙ্গাব্দ, কলকাতা’; ঐ; পৃ. ৭৩

৪৫. ঐ; ‘শ্রাবণ, ১৩৯৪ বঙ্গাব্দ, কলকাতা’; ঐ; পৃ. ৭৩

৪৬. বিনয় মজুমদার; ‘আমি তো প্রত্যেকবার’; শ্রেষ্ঠ কবিতা; দে’জ পাবলিশিং; পঞ্চম সংস্করণ : জুন ২০০৭, জ্যৈষ্ঠ ১৪১৪; কোলকাতা – ৭০০ ০৭৩; পৃ. ৯০

৪৭. বিনয় মজুমদার; ‘১১.৪.৮৮’; (বিনয় মজুমদারে ডায়েরি – ১৯৮৮); বিনয় মজুমদারের ডায়েরি, (সম্পা.) অজয় নাগ, কমল মুখোপাধ্যায়; শিলীন্ধ্র প্রকাশন, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ : জানুয়ারি ২০০৬, কলকাতা পুস্তকমেলা; কলকাতা ৭০০ ০৯০; পৃ. ৭৬

৪৮. ঐ, ‘১২.৪.৮৮’, ঐ, পৃ. ৭৬

৪৯. ঐ, ‘১৩.৪.৮৮’, ঐ, পৃ. ৭৭

৫০. ঐ; ‘শনিবার, (১৬.৪.৮৮)’; ঐ; পৃ. ৭৮

৫১. ঐ; ‘সোমবার, (১৮.৪.৮৮)’; ঐ; পৃ. ৭৯

৫২. ঐ, ‘২০.৪.৮৮’, ঐ, পৃ. ৮০

৫৩. ঐ, ‘২১.৪.৮৮’, ঐ, পৃ. ৮১

৫৪. ঐ, '২৯.৪.৮৮', ঐ, পৃ. ৮৪

৫৫. ঐ, '৪.৫.৮৮', ঐ, পৃ. ৮৬

৫৬. ঐ, '৭.৫.৮৮', ঐ, পৃ. ৮৭

৫৭. ঐ, '১০.৫.৮৮', ঐ, পৃ. ৮৮

৫৮. ঐ, '১৩.৫.৮৮', ঐ, পৃ. ৮৯

৫৯. ঐ, '১৪.৫.৮৮', ঐ, পৃ. ৮৯

৬০. ঐ, '১৬.৫.৮৮', ঐ, পৃ. ৯০

৬১. ঐ, '১৯.৫.৮৮', ঐ, পৃ. ৯১

৬২. ঐ, '২৭.৫.৮৮', ঐ, পৃ. ৯২

৬৩. ঐ, '১.৬.৮৮', ঐ, পৃ. ৯৪

৬৪. ঐ, '১৫.৬.৮৮', ঐ, পৃ. ৯৬

৬৫. ঐ, '১২.৪.৮৮', ঐ, পৃ. ৭৬

৬৬. ঐ; 'রবিবার, (১৭.৪.৮৮)'; ঐ; পৃ. ৭৮

৬৭. ঐ, 'সোমবার (২৫ এপ্রিল)', ঐ, পৃ. ৮৩

৬৮. ঐ, '১৫.৪.৮৮', ঐ, পৃ. ৭৮

এ-এন্ট্রির প্রায় এক যুগ আগেই 'বাল্মীকি'-র বিনয় তাঁর রবীন্দ্র-মোহাবেশটিকে কবিতায় ধরেছেন—

"তবে তো রবীন্দ্রনাথ আসা আছে, তুমি আছো কলকাতা থেকে দূরে গ্রামে
যেখানে সমস্যা আর সমাধান পাশাপাশি শুয়ে থাকে প্রকৃতি রয়েছে।
ব্যর্থকাম চিমনির গ্লানি রোজ আকাশের রাঙা গালে কালিমা লেপন
সেখানে করে না; তুমি শিখেছো কেমন ভাবে কথা বলে বিবাহিতা নদী।
এত জল নিয়েও সে অতি অকপটে চায় কার্তিকের কিছুটা শিশির।
তুমি সেইখান থাকো নদীর ভিতরে। তীরে কাশবন হাত বোলাতেই
দেখা গেলো তুমি এক বিরাট পুরুষ আহা হাজার মাইল লম্বা, তবে
তোমাকে তো এখানেই থেকে যেতে হবে এই গ্রামাঞ্চলে মরণ অবধি।
তোমার অভিজ্ঞ ছন্দ, হৃদয়ের রস যারা মুখোমুখি ব'সে পায় তারা

তোমার কবিতা বোঝে, শুধু তারা—এইসব নভোচারী ধবল বলাকা।

এদের রটনা শুনে শালিকেরা দায়ে প'ড়ে মেনে নেয় তুমি এক কবি।

কে না জানে পৃথিবীকে খুব বেশি দূর থেকে অন্য গ্রহ থেকে দেখলেই

একটি নক্ষত্র ব'লে মনে হয়, এই সত্য চিরদিন মনে ক'রে রেখে

কী যেন করেছো তুমি—এই ব'লে [বলে] শালিকেরা আরও দূরে স'রে যেতে যেতে।"

দ্র. ঐ; 'রবীন্দ্রনাথ'; (কা.গ্র. 'বাল্মীকির কবিতা'); কাব্যসমগ্র (দ্বিতীয় খণ্ড); প্রতিভাস; (সম্পা.) শ্রীতরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়; প্রথম প্রকাশ : ১লা বৈশাখ ১৪০৯, এপ্রিল ২০০২; কলকাতা-২; পৃ. ৫০

আর বেলাশেষের বিনয়ের আহূত উপলব্ধিটি ছিলো এই—

"পৃথিবী নামক গ্রহের নাম

পালটে ফেলা হয়েছে।

সকলেরই কৌতূহল থাকা স্বাভাবিক

পৃথিবীর বদলে এই গ্রহের

নতুন নামটি কী?

সবার অবগতির জন্য জানাই

নতুন নামটি 'রবীন্দ্র গ্রহ'।

পৃথিবীর সব ভূগোলের বইতে

ছাপুন 'আমরা রবীন্দ্র গ্রহে বাস করি।'"

দ্র. ঐ, 'পৃথিবী নামক', (কা.গ্র. 'এখন দ্বিতীয় শৈশবে') ঐ, পৃ. ১৮৫

আরও কিছু কবিতায় বিনয়ের রবীন্দ্র-প্রণতি এভাবেই ঝরে পড়ছে দেখতে পাই।

দ্র. ঐ, 'আমি এখন', (কা.গ্র. 'আমিই গণিতের শূন্য'), ঐ, পৃ. ১৬২

দ্র. ঐ, 'গত ঊনবিংশ', (কা.গ্র. 'এখন দ্বিতীয় শৈশবে'), ঐ, পৃ. ১৮৪

৬৯. ঐ, '১৩.৫.৮৮', (বিনয় মজুমদারে ডায়েরি – ১৯৮৮); বিনয় মজুমদারের ডায়েরি, (সম্পা.) অজয় নাগ, কমল মুখোপাধ্যায়; শিলীন্ধ্র প্রকাশন, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ : জানুয়ারি ২০০৬, কলকাতা পুস্তকমেলা; কলকাতা ৭০০ ০৯০; পৃ. ৮৯

৭০. ঐ, '১.৬.৮৮', ঐ, পৃ. ৯৪

৭১. দ্র. ঐ, 'শনিবার (২৩.৪.৮৮)', ঐ, পৃ. ৮২;

দ্র. ঐ, '৬.৫.৮৮', ঐ, পৃ. ৮৬

৭২. দ্র. ঐ, '১.৬.৮৮', ঐ, পৃ. ৯৪

৭৩. দ্র. ঐ, '৩০.৪.৮৮', ঐ, পৃ. ৮৫

৭৪. দ্র. ঐ, '১৯.৪.৮৮', ঐ, পৃ. ৮০

৭৫. দ্র. ঐ; '১১.৬.৮৮ (২৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯৫)'; ঐ, পৃ. ৯৫

৭৬. ঐ, '২১.৪.৮৮', ঐ, পৃ. ৮১

৭৭. ঐ, '২৮.৪.৮৮', ঐ, পৃ. ৮৪

৭৮. বিনয় মজুমদার, 'নকশাল আন্দোলনকে আমি অপছন্দ করতাম', তাং— ১২/১/২০০৬, কথোপকথনে— স্নিগ্ধদীপ চক্রবর্তী ও পিনাক বণিক, অহর্নিশ, দশম বর্ষ চতুর্দশ সংকলন শীত ১৪১৩, শুভাশিস চক্রবর্তী কর্তৃক ৫০৫/৮ অশোকনগর, উত্তর ২৪ পরগনা থেকে প্রকাশিত, পৃ. ৯

৭৯. ঐ; 'রবিবার (২৪.৪.৮৮)'; (বিনয় মজুমদারে ডায়েরি – ১৯৮৮); বিনয় মজুমদারের ডায়েরি, (সম্পা.) অজয় নাগ, কমল মুখোপাধ্যায়; শিলীন্ধ্র প্রকাশন, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ : জানুয়ারি ২০০৬, কলকাতা পুস্তকমেলা; কলকাতা ৭০০ ০৯০; পৃ. ৮২

৮০. ঐ, '২৭.৪.৮৮', ঐ, পৃ. ৮৪

৮১. ঐ, '২৯.৫.৮৮', ঐ, পৃ. ৯৩

৮২. ঐ, '১৮.৬.৮৮ (৩ আষাঢ়)', ঐ, পৃ. ৯৮

৮৩. ঐ, '২৫.৬.৮৮', ঐ, পৃ. ৯৮

৮৪. ঐ, '২৭.৫.৮৮', ঐ, পৃ. ৯২

৮৫. ঐ, '৩০.৫.৮৮', ঐ, পৃ. ৯৩

৮৬. ঐ; 'শনিবার, (১৬.৪.৮৮)'; ঐ; পৃ. ৭৮

৮৭. ঐ; 'সোমবার, (১৮.৪.৮৮)'; ঐ; পৃ. ৭৯

৮৮. ঐ, '৩.৫.৮৮', ঐ, পৃ. ৮৬

৮৯. ঐ, '৪.৫.৮৮', ঐ, পৃ. ৮৬

৯০. ঐ, '৬.৫.৮৮', ঐ, পৃ. ৮৭

৯১. ঐ, '৮.৫.৮৮', ঐ, পৃ. ৮৭

৯২. ঐ, '২৯.৫.৮৮', ঐ, পৃ. ৯২

৯৩. ঐ, '৯.৬.৮৮', ঐ, পৃ. ৯৫

৯৪. ঐ; 'রবিবার, ২৯ জ্যৈষ্ঠ'; ঐ; পৃ. ৯৬

৯৫. ঐ; 'সোমবার, ৩০ জ্যৈষ্ঠ'; ঐ

৯৬. ঐ, '১৫.৬.৮৮', ঐ, পৃ. ৯৬-৯৭

৯৭. ঐ, '১৭.৬.৮৮ (২ আষাঢ়)', ঐ, পৃ. ৯৭

৯৮. দ্র. ঐ, '৬.৫.৮৮', ঐ, পৃ. ৮৬

৯৯. দ্র. ঐ, '২৫.৬.৮৮', ঐ, পৃ. ৯৯

১০০. দ্র. অজয় নাগ, কমল মুখোপাধ্যায়; 'বিনয়ের ডায়েরি সম্পর্কে :'; (বিনয় মজুমদারে ডায়েরি – ১৯৮৮); বিনয় মজুমদারের ডায়েরি, (সম্পা.) অজয় নাগ, কমল মুখোপাধ্যায়; শিলীন্ধ্র প্রকাশন, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ : জানুয়ারি ২০০৬, কলকাতা পুস্তকমেলা; কলকাতা ৭০০ ০৯০; পৃ. ৯৯

১০১. দ্র. বিনয় মজুমদার, '১৬.৫.৮৮', ঐ, পৃ. ৯০;

দ্র. ঐ, '১৮.৫.৮৮', ঐ, পৃ. ৯১;

দ্র. ঐ, '১৯.৫.৮৮', ঐ

দ্র. ঐ, '১.৬.৮৮', ঐ, পৃ. ৯৪;

দ্র. ঐ, '১৪.৬.৮৮ (৩১ জ্যৈষ্ঠ)', ঐ, পৃ. ৯৬;

দ্র. ঐ, '১৫.৬.৮৮', ঐ

১০২. দ্র. ঐ, '১৬.৬.৮৮', ঐ, পৃ. ৯৭

১০৩. দ্র. ঐ, '৮.৫.৮৮', ঐ, পৃ. ৮৭;

দ্র. ঐ; '৮ জ্যৈষ্ঠ, রবিবার (২২.৫.৮৮)'; ঐ; পৃ. ৯২

১০৪. দ্র. ঐ, '২৬ বৈশাখ (৯.৫.৮৮)', ঐ, পৃ. ৮৮

১০৫. দ্র. ঐ, '১২.৫.৮৮', ঐ, পৃ. ৮৯

১০৬. ঐ, '১৪.৬.৮৮ (৩১ জ্যৈষ্ঠ)', ঐ, পৃ. ৯৬

১০৭. ঐ, '২৩.৬.৮৮ (৮ আষাঢ়)', ঐ, পৃ. ৯৮

১০৮. ঐ, '২৮.৪.৮৮', ঐ, পৃ. ৮৪

১০৯. ঐ, '১১.৬.৮৮ (২৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯৫)', ঐ, পৃ. ৯৫

১১০. ঐ, ‘শনিবার (২৩.৪.৮৮)’, ঐ, পৃ. ৮২

১১১. ঐ, ‘২৮.৪.৮৮’, ঐ, পৃ. ৮৪

১১২. ঐ, ‘৩১.৫.৮৮’, ঐ, পৃ. ৯৪

১১৩. বিনয় মজুমদার; ‘বিচ্ছিন্ন দিনলিপি’(তারিখ অনুল্লেখিত); বিনয় মজুমদারের ডায়েরি, (সম্পা.) অজয় নাগ, কমল মুখোপাধ্যায়; শিলীন্ধ্র প্রকাশন, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ : জানুয়ারি ২০০৬, কলকাতা পুস্তকমেলা; কলকাতা ৭০০ ০৯০; পৃ. ১০৩